প্রিয়বরেষু

...অনেক ভাবনা চিন্তা করেও কি নিয়ে উপন্যাস লিখব, তা কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না। একটা পুরনো ডায়েরি খুঁজতে গিয়ে টেবিলের নীচের ড্রয়ারে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার এক দিদির অনেকগুলো চিঠি পেলাম। চিঠিগুলো পড়তে পড়তে মনে হল, এই চিঠিগুলো ছাপিয়ে দিলেই একটা উপন্যাস হতে পারে।

আমার এই দিদির নাম কবিতা চৌধুরী। থাকেন নিউইয়র্কে। চাকরি করেন ইউনাইটেড নেশানস্-এ। ইউনাইটেড নেশানস্-এর স্পেশ্যাল কমিটির কাজে দিদিকে ঘুরতে হয় নানা দেশে। ইউনাইটেড নেশানস্-এর ক্যাফেটেরিয়ায় দিদির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তারপর আস্তে আস্তে দুজনে দুজনের কাছে এসেছি। খুব কাছে। আজ বোধহয় দিদি আমার চাইতে কাউকে বেশি ভালোবাসেন না। বিশ্বাসও করেন না। আমি দিদিকে শুধু শুধু ভালোবাসি না, শ্রদ্ধা করি। দিদি আমার সত্যিই অনন্যা।

দিদি যখন যেখানেই থাকুন না কেন, আমাকে চিঠি লিখবেনই। কখনও ছোট। নিদেনপক্ষে পিকচার পোস্টকার্ডের পিছনে লিখবেন, ঘণ্টাখানেক সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে কাটিয়ে কলম্বো হয়ে কায়রো যাচ্ছি। ওখানে পৌঁছে চিঠি দেব। দিদি বলেন, তোমাকে চিঠি লিখতে বসলেই মনে হয়, তুমি আমার সামনে বসে বসে অথবা আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার কথা শুনছ। তাই তোমাকে চিঠি না লিখে পারি না। আমি অবশ্য খুব কমই চিঠি লিখি। মাঝে মাঝে আমরা দু'ভাইবোনে ভারি মজা করি। দিদি ব্যস্ততার জন্য চিঠি লিখতে না পারলে কয়েকদিনের ডায়েরির কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে দিদিকে পাঠিয়ে দিই।

যাই হোক দিদির জীবনটা বড়ই বিচিত্র। এ সংসারে সাধারণ মানুষ যা কিছু কামনা করে, সেসব কিছুই দিদির আছে। দিদির বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপ-যৌবন যে কোনো মানুষকে মুগ্ধ করবেই। অর্থ প্রতিপত্তির অভাব নেই। অভাব নেই আত্মীয়-বন্ধুর। এত কিছু পেয়েও দিদির অনেক জ্বালা, অনেক দুঃখ। এই পৃথিবীর বহু মানুষের বিরুদ্ধে দিদির অনেক অভিমান, অনেক অভিযোগ। দিদিকে হঠাৎ দেখলে, আলাপ করলে কিছু বুঝা যায় না ; জানা যায় না দিদি আমার একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।

আর বেশি লিখতে চাই না। দিদির চিঠি আর ডায়েরির ছেঁড়া পাতাগুলো পড়লেই সবকিছু জানা যাবে। দিদির নাম ঠিকানা আর অন্যান্য পাত্র-মিত্রের নাম-ঠিকানা বদলে দিয়েছি। তা নয়তো আমাদের দেশের অনেক গুণী-জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তিরা বড়ই বিপদে পড়বেন।...

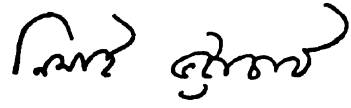

প্রিয়বরেষু ভাই রিপোর্টার,

ভেবেছিলাম এ সব কথা কোনোদিন কাউকে বলব না। কিছুতেই না। অসম্ভব। এ সব কথা বলার নয়। বলা যায় না। বোধহয় উচিতও নয়। হাজার হোক এই পৃথিবীটা এখনও পুরুষদের রাজত্ব। আমরা মেয়েরা অনেক কিছু পেয়েছি, অনেক কিছু করছি কিন্তু রাজার আসনে এখনও তোমরা পুরুষরা বসে আছো ভারতবর্ষে, চীন-জাপান, ইউরোপ, আমেরিকায়। সর্বত্র।

তাছাড়া কোনোদিন ভাবিনি আমি কোনো পুরুষকে ভালোবাসব বা বিশ্বাস করব। কিন্তু তুমি আমার জীবনে এসে সবকিছু গণ্ডগোল করে দিলে। অসংখ্য পুরুষের সঙ্গে আমার আলাপ। ঘনিষ্ঠতাও আছে কয়েকজনের সঙ্গে। অধিকাংশ পুরুষ আমার কাছে এলেই কেমন যেন হিংস্র পশুর মতো আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি শিশু নই। তাদের লোলুপ দৃষ্টির অর্থ আমি বুঝতে পারি। তাছাড়া ওরা সবাই যেন দ্বিধায়, সঙ্কোচে প্রায় শিশুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসেন। আর তুমি? এমন নাটকীয় ভাবে ও অপ্রত্যাশিত ঝড়ের বেগে আমার সামনে এসে হাজির হলে যে আমি কিছুতেই তোমাকে সরিয়ে দিতে পারলাম না। সেদিনের কথা ভেবে আজও আমার হাসি পায়।

দিদি, আমি এই মহাদেশে একজন নবাগত বাঙালি সাংবাদিক।

আমি অবাক হয়ে তোমার দিকে তাকাতেই তুমি প্রশ্ন করলে, আপনিই তো কবিতা চৌধুরী?

হ্যাঁ।

তুমি নির্বিবাদে এক পেয়ালা কফি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, ব্যস! তাহলে ভুল করিনি। কফি নিন।

কিন্তু...

দিদি বলে যখন ডেকেছি তখন আবার কিন্তু কেন? তাছাড়া আপনি অত্যন্ত সুন্দরী হলেও আমার বদ মতলব নেই। আফটার অল আমি আপনার ছোট ভাই।

সো কাইন্ড অফ ইউ, বাট।

আবার কিন্তু? নাও নাও, কফি খাও।

আপনি...

ছোট ভাইকে কেউ আপনি বলে? খুব বেশি সম্মান দিতে চাও তো তুমি বল। তুই বললেও আপত্তি নেই।

তোমার কথা শুনে আমি না হেসে পারলাম না। হাসতে হাসতেই কফির পেয়ালাটা হাতে নিলাম।

না, না, দিদি, হাসির কথা নয়। নিউইয়র্কের মতো শহরে তোমার মতো একজন দিদি অত্যন্ত দরকার।

কেন?

এখুনি বলব?

আপত্তি না থাকলে...

দিদি বলে যখন ডেকেছি তখন কোনো কিছু বলতেই আপত্তি নেই।

তাহলে বলুন।

আবার বলুন?

আমি একটু হাসি। বলি, হাজার হোক আমার বেশি বয়স নয়। তারপর পকেটে কয়েক শ' ডলারের ট্রাভেলার্স চেক আছে। আর মাথায় কখন কোনো্ বদ বুদ্ধি আসে, তার কি ঠিক আছে?

কফি খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আমার কি ভূমিকা তা তো বুঝলাম না।

হা ভগবান! ছোট ভাই অধঃপাতে গেলে দিদির কি ভূমিকা তাও বলে দিতে হবে?

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে তুমি বলেছিলে, আরো একটা বিশেষ কারণে তোমাকে আমার দরকার।

কি সেই বিশেষ কারণ?

তুমি পকেট থেকে পার্স বের করে একটা সুন্দরী মেয়ের ফটো দেখিয়ে বললে, এই কালো কুচ্ছিত মেয়েটাকে আমি বিশেষ ভালোবাসি না, কিন্তু মেয়েটা আমাকে সত্যি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ওর ধারণা আমেরিকার সব সুন্দরী মেয়েই আমার প্রেমে পড়বে।

তুমি এমন সিরিয়াস হয়ে কথাগুলো বললে যে আমি অনেক চেষ্টা করেও হাসি চাপতে পারলাম না।

না, না, দিদি হাসির কথা নয়। আমাকে নিয়ে সত্যি ওর বড় ভয়।

কিসের ভয়?

যদি আমি ওকে ভুলে যাই। ও যদি আমাকে হারায়!

তোমার কথাবার্তা শুনে আমার ভারি মজা লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, ওর নাম কি?

দিদি, এখনই সবকিছু বলব?

আচ্ছা, পরে শুনব।

আমি তোমার চেয়ে বয়সে খুব বেশি বড় না। বোধহয় আমরা দুজনেই সমবয়সী। তা হোক। তুমি সত্যি আমাকে দিদির মতো ভালোবাস, শ্রদ্ধা কর। আমিও তোমাকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসি। ভালোবাসতে বাধ্য হয়েছি। প্রথমে নিশ্চয়ই একটু দ্বিধা ছিল। ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবে মনের মেঘ কেটে যেতে বিশেষ সময় লাগেনি। সেদিন বলতে পারিনি কিন্তু আজ স্বীকার করছি, প্রথম দিনই তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল। তোমার চোখের দৃষ্টিতে কোনো নোংরামি দেখিনি, তোমার কথাবার্তা বা ব্যবহারে কোনো নীচতার ইঙ্গিতও পাইনি।

আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি, তোমাকে আমি ভালোবাসি, স্নেহ করি এবং তোমার ভালোবাসায় আমি ধন্য হয়েছি। নিউইয়র্ক ছেড়ে যাবার দিন এয়ারপোর্টে তুমি আমাকে প্রণাম করলে, ছোট্ট শিশুর মতো অজোরে কাঁদলে। আমিও তোমার চিবুকে চুমু খেয়ে তোমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চোখের জল না ফেলে পারিনি। আমার মনের মধ্যে যেটুকু দ্বিধা, গ্লানি ছিল, তোমার চোখের জলে সেটুকুও ধুয়ে গেল। আজ আমি সারা পৃথিবীর সামনে গর্ব করে বলতে পারি, তুমি আমার ভাই, আমি তোমার দিদি। তোমার নিশ্চয়ই আরো অনেক দিদি আছেন কিন্তু আজ তুমিই আমার একমাত্র ভাই, বন্ধু ও আপনজন। একদিন আমিও অনেকের দিদি ছিলাম। এই সংসারের অন্যান্যদের মতো আমারও আত্মীয়স্বজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন নানা

জায়গায়, কিন্তু আস্তে আস্তে আমি অনেক দূরে সরে এসেছি। স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে।

ইউনাইটেড নেশনস্-এর ক্যাফেটেরিয়ায় তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর যখন তুমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে প্রথম এসেছিলে, তখন আমাদের কি কথাবার্তা হয়েছিল, তা তোমার মনে আছে? এতদিন পর হয়তো তোমার সেদিনের কথা মনে নেই কিন্তু আমার মনে আছে। কিচ্ছু ভুলিনি।

তুমি আমার ঘরদোর-সংসার দেখার পর বলেছিলে, দিদি, তুমি বেশ আছ।

বেশ আছি মানে?

মানে ভগবান দশ হাত উজাড় করে তোমাকে সবকিছু দিয়েছেন।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি এমন দেখলে যে এ কথা বলছ?

ভগবান কি তোমাকে দেননি? বিদ্যা-বুদ্ধি, রূপ-যৌবন, অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি,.।

আমি হাসতে হাসতেই আবার প্রশ্ন করি, আর কিছু?

না, না, দিদি, হাসির কথা নয়। এ সংসারে মানুষ যা যা কামনা করে, তার সবকিছুই তুমি পেয়েছ।

আমি যেন আপন মনেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ভগবান আমাকে সবকিছু দিয়েছেন, তাই না?

একশোবার দিয়েছেন।

আমি তোমার চিবুক ধরে আদর করে বলেছিলাম, কই, ভগবান তো এই ভাইকে আগে দেননি?

ভগবান তো তোমাদের আমেরিকার মতো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলে বসেননি যে একেবারে ঝুড়ি ভরে সবকিছু কিনে আনবেন।

আমি তর্ক না করে শুধু বলেছিলাম, ভাই, ভগবানের দোকানেও কিছু না দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। আমাকে বোধহয় একটু বেশিই দিতে হয়েছে।

সেদিন তুমি আর প্রশ্ন করনি। আমিও আর কিছু বলিনি। বোধহয় তুমি আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারনি। অবশ্য বুঝতে পারলেও সেদিন তোমাকে কিছুতেই বলতে পারতাম না। সেদিন তোমাকে ভালো লাগলেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতাম না। এখন তোমাকে সবকিছু বলতে পারি। বলব। আমি জানি তুমি আমার কোনো ক্ষতি করবে না। মনে মনে বিশ্বাস করি, তুমি তোমার দিদির দুঃখ উপলব্ধি করবে।

আজ বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি অত্যন্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। অনেক অলিগলি, রাজপথ-জনপথ, অনেক মানুষ, অনেক দেশ-মহাদেশ, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আজ আমি নিউ ইয়র্কে। কিন্তু ভাই, বিশ্বাস কর, জীবনের এই পথটুকু পার হতেই আমাকে প্রত্যেকটা খেয়াঘাটে কিছু না কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে। সে-সব কাহিনি আস্তে আস্তে তোমাকে বলব। না বলে থাকতে পারব না। জীবনের চরমতম গোপন কাহিনিও চিরদিনের জন্য নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায় না। অসম্ভব। আমিও আর পারছি না। দীর্ঘদিন ধরে এ বোঝা একা একা বহন করা যায় না। তাই তোমাকে সবকিছু বলে আমি একটু হালকা হতে চাই।

বাইরে থেকে সবাই আমার রূপ দেখে, যৌবন দেখে। কিন্তু এই রূপের জ্বালা, যৌবনের দাহ যে কি অসহ্য ও মর্মান্তিক, তা কেউ জানে না, জানতেও চায় না। আমার মুখের হাসি দেখেই সবাই ভাবে আমার জীবনেও কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছিল, এসেছিল শ্রাবণের ধারা, জমেছিল ভাদ্দরের মেঘ। এই সংসারে একটি নিঃসঙ্গ মেয়েকে পথ চলতে হলে যে প্রতি পদক্ষেপে

কত বিপদ, কত নোংরামির মুখোমুখি হতে হয়, তা বলতেও ঘেন্না হয়। লজ্জা হয়। তবু আমি তোমাকে সব কিছুই বলব। সমাজের ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও যে কত দৈন্য, কত নোংরামি, কত নীচতা ও হীনতা থাকতে পারে, তা জানলে তুমি স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

আচ্ছা ভাই, আমার কাহিনি শুনে আমাকে দূরে সরিয়ে দেবে না তো? ঘেন্না করবে না তো? খারাপ ভাবলে নাকি?

নিজের স্বপক্ষে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের অন্যান্য মেয়েদের মতো আমিও খুব বেশি উচ্চাভিলাষিণী ছিলাম না। বেথুন বা ভিক্টোরিয়া স্কুলের গণ্ডী পার হবার পর সাত পাকে বাঁধা পড়লেই সুখী হতাম কিন্তু বিধাতা পুরুষ আমাকে সহজ সরলভাবে এগিয়ে যেতে দিলেন না। শৈশব থেকেই বাধা দিতে শুরু করলেন। ধাপে ধাপে, প্রতিটি পদক্ষেপে। আমার জীবনে যত বাধা এসেছে, আমিও তত বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি, কিছুতেই হার স্বীকার করিনি। প্রতিটি খেয়াঘাটে কিছু সম্পদ হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু কোনো খেয়াঘাটেই দাঁড়িয়ে থাকিনি। পার হয়েছি। আমি কি খুব অন্যায় করেছি?

পুরুষদের আমি অবিশ্বাস করি, ঘেন্না করি কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমার সমস্ত অভিযোগ তোমার ভগবানের বিরুদ্ধে। তিনি কেন আমাকে সহজ, সরল পথে এগুতে দিলেন না? আমার মতো একটা নিঃসঙ্গ মেয়ের কিছু সম্পদ কেড়ে না নিলে কি তাঁর আত্মার তৃপ্তির হচ্ছিল না?

তোমরা দুজনে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

দুই

তোমার চিঠি পেলাম। তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আমার চিঠির জবাব দেবে, তা ভাবতে পারিনি। মনে হয়, তুমি আমার চিঠি পড়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছ এবং সেজন্য আমার চিঠি পাবার পরদিনই জবাব দিয়েছ। তুমি যে আমাকে কত ভালোবাস, তা তোমার চিঠি পড়তে পড়তে বার বার উপলব্ধি করেছি। তোমাকে ভালোবেসে আমি যে ভুল করিনি, তা আরেকবার বুঝতে পারলাম।

তোমার চিঠিটা অনেকবার পড়েছি। পড়তে পড়তে আমার প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে। তারপর অনেক ভেবেছি। দু'তিন দিন শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। মনে মনে বিচার করেছি তোমার পরামর্শ। হয়তো পুরনো দিনের দুঃখের স্মৃতি রোমন্থন করার কোনো সার্থকতা নেই, কিন্তু ভাই, অতীতকে তো একেবারে মুছে ফেলা যায় না। তাছাড়া অতীতের ওপরই তো বর্তমান গড়ে উঠেছে। আবার আজকের এই বর্তমানের ভিতর থেকেই জন্ম নেবে ভবিষ্যত। সুতরাং অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত অবিচ্ছিন্ন।

বাইরের কাজকর্ম বা আচারে-ব্যবহারে আমরা অনেক সময় এই অবিচ্ছিন্নতার ধারাকে স্বীকৃতি দিই না। দিতে চাই না ; হয়তো দিতে পারি না। কিন্তু মন? তাকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমি তোমাকে সেই মনের কথাই বলব। আজ অনেক বছর ধরে নিজের মনের সঙ্গে নিজেই লুকোচুরি খেলছি। খেলতে খেলতে অনেকদিন আগেই হাঁপিয়ে গেছি কিন্তু এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য মানুষ পাইনি, যার কাছে ধরা দিতে পারি। তোমার কাছে আমি ধরা দেবই। দিতেই হবে। না দিয়ে আর যেন নিশ্বাস নিতে পারছি না। তোমার কাছে ধরা না দিলে আমি বোধহয়

আর বাঁচব না।

অন্য কেউ জানে না কিন্তু আজ আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি, মনের মধ্যে দ্বন্দ্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আমি দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা করি। দু'বারই অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছি। সেবার লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক আসার সময় বিষ নিয়ে প্লেনের টয়লেটে ঢুকেছিলাম। বিষ খাবার আগে কি যেন ভাবছিলাম। নানা চিন্তায় টয়লেটের দরজা লক্ করতে ভুলে যাই। কিছুক্ষণ পরে একজন মহিলা যাত্রী হঠাৎ দরজা খুলে টয়লেটে ঢুকতেই আমি চমকে উঠি এবং কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি।

এই পৃথিবীতে একলা থাকার অনেক আনন্দ, অনেক সুবিধা, কিন্তু দুঃখও কম নয়। নিঃসঙ্গ মানুষ কোনো আনন্দই পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে পারে না ঠিকই, কিন্তু একা একা দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা সবারই সীমিত। কোনো আদর্শ বা কোনো প্রিয়পাত্রের জন্য অনেক দুঃখ সহ্য করা যায়, কিন্তু নিজের জন্য তার একাংশও অসহ্য। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জ্বালা কম নয়। তাইতো আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়, একার জন্য কেন এই জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করি? যে মানুষ চির বিদায় নিলেও এই পৃথিবীর কোনো মানুষের চোখের জল পড়বে না, তখন তার বেঁচে থাকার কি সার্থকতা?

এইসব আলতু ফালতু হাজার রকমের চিন্তা করতে করতে আবার একদিন ঠিক করলাম, না, আর নয়। এবার এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়াই ভালো।

ভালো বা মন্দ, কোনো বিষয়েই উৎসাহ বা বাধা দেবার মতো কোনো ঘনিষ্ঠ মানুষ আমার নেই। তাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নেবার পর আর দেরি করলাম না কিন্তু সেবারও পারলাম না। প্রায় অন্তিম মুহূর্তে ওয়াশিংটন থেকে সুদীপ্ত আর মহুয়া তুতুলকে নিয়ে হাজির। ওয়াশিংটনে ওদের সঙ্গে কি তোমার আলাপ হয়েছে? বোধহয় হয়নি ; মনে হয় ওদের সঙ্গে আলাপ হলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বলতে।

আমি নিউইয়র্কে আসার বছর দুই আগেই সুদীপ্ত এদেশে এসেছে। কিন্তু মাত্র বছর পাঁচেক আগে এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ওর সঙ্গে আমার আলাপ।

ঘরে ঢুকেই দেখি সুদীপ্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আমার বন্ধু মায়াকে বলছে, দেখ ছোড়দি, এই সংসারে সমস্ত স্নেহ ভালোবাসায় সঙ্গেই কোনো না কোনো স্বার্থ জড়িয়ে আছে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এ সংসারে দুর্লভ।

মায়া ওকে বকুনি দিয়ে বলল, দেখ খোকন, তুই বড্ড সিনিক হয়ে গেছিস। স্নেহ-ভালোবাসা না থাকলে সমাজ সংসার চলছে কি ভাবে?

সুদীপ্ত হেসে বলল, কেন চলবে না? পারস্পরিক স্বার্থে আমরা সবাই জড়িয়ে পড়েছি। বলেই সমাজ সংসার গড় গড় করে এগিয়ে চলছে।

মায়ার স্বামী ডক্টর সরকার এবার হাসতে হাসতে ওর স্ত্রীকে বললেন, তোমরা কি এবার চুপ করবে নাকি আমি আমার বান্ধবীকে নিয়ে দু-এক ঘণ্টার জন্য ব্যাটারি পার্ক ঘুরে আসব?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আপনার মতো স্ত্রৈণ পুরুষের সঙ্গে ব্যাটারি পার্ক তো দূরের কথা, হাওয়াই আইল্যান্ডে যেতেও আমি ইন্টারেস্টেড নই।

মায়া একটু গম্ভীর হয়েই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক বলেছিস। বিয়ের আগে জানলে আমিই এ বিয়েতে আপত্তি করতাম।

ডক্টর সরকার স্বল্পভাষী। আত্মকেন্দ্রিক। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেও একখানা বই নিয়ে

সারা সন্ধে কাটিয়ে দেন। তবে রসিক লোক। বললেন, দেখুন মিস চৌধুরী, আর্টিফিসিয়্যাল জুয়েলারি ব্যবহার করে করে আসল সোনার গহনা আর আপনাদের ভালো লাগে না।

আমরা কিছু বলার আগেই সুদীপ্ত বলল, ঠিক বলেছেন কমলদা।

মায়া কৃষ্ণনগরের মেয়ে। সুদীপ্তদের বাড়িও ওখানেই। সুদীপ্তর ছোড়দি আর মায়া স্কুলে একসঙ্গে পড়ত। সেই সূত্রেই এ বাড়িতে সুদীপ্তর যাতায়াত। সেদিন থেকেই যাতায়াত।

সেদিন থেকেই সুদীপ্তকে আমার বেশ লাগে। আশে পাশে যাদের দেখি, তাদের থেকে ও একটু স্বতন্ত্র। হঠাৎ ওর কথাবার্তা শুনলে মনে হবে ও যেন এই পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যই এই পৃথিবীতে এসেছে। সব মানুষের বিরুদ্ধেই যেন ওর অভিযোগ। বাবা-মা, ভাই-বোন কাউকেই ও ভালোবাসে না অথচ ওদের প্রতি কর্তব্যে ত্রুটি নেই। প্রতি মাসে ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক মারফত দেশে টাকা পাঠাবেই।

পৃথিবীর বিরুদ্ধে সুদীপ্তর অভিযোগের কারণ আছে। রেলের স্টেশন মাস্টারের ঘরে জন্মেছে। শৈশব বা কৈশোরে দারিদ্রের সঙ্গে পরিচয় হবার কোনো সুযোগ হয়নি কিন্তু যৌবনের সিংহদ্বার পেরুতে না পেরুতেই ওর বাবা রিটায়ার করলেন। এক নিমেষে সুখের সংসার কোথায় ভেসে গেল। দারিদ্রের হাহাকার উঠল চারদিক থেকে। সুদীপ্ত জানল, তার বাবার অসৎ আয়ের দৌলতেই তার শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি মধুময় হয়েছিল। কি একটা বিচ্ছিরি বিস্বাদে ওর সারা মন ভরে গেল।

আমার অ্যাপার্টমেন্টে দু-একদিন আসা যাওয়ার পর সুদীপ্ত একদিন কথায় কথায় বলল, দেখ কবিতাদি, একটা চরম সত্য আমি মর্মে মর্মে বুঝেছি।

কী সেই চরম সত্য?

এই পৃথিবীতে টাকা ছড়াতে পারলে সবার ভালোবাসা পাওয়া যায় আর না ছড়াতে পারলে বাবা-মার স্নেহও পাওয়া যায় না।

আমি আর প্রশ্ন করি না। একটু হাসি।

না, না, কবিতাদি, হাসির কথা নয়, আমি আমার বাবা-মা ভাই-বোন আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে দেখেছি বলেই বলছি।

আমি কোনো মন্তব্য করি না, শুধু শুনি।

সুদীপ্ত একটু উত্তেজিত হয়েই বলল, আমার বাবার অসৎ উপায়ের টাকা উপভোগ করতে মার ভালো লাগত কিন্তু বাবার দুঃখের দিনে মার ব্যবহার দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। আমার দাদা আর দুই দিদির কীর্তি শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

বিচিত্র ছেলে এই সুদীপ্ত! বাবা-মা ভাই-বোনের উপর রাগ করে এ দেশে আসার চার বছর পর কলম্বিয়া থেকে ডক্টরেট হয়। তারপর বছর দুই কানাডায় চাকরি করার পর হঠাৎ একদিন মায়ার কাছে হাজির হয়ে বলল, ছোড়দি, এখানে আর একা একা থাকতে পারছি না। তুমি আমার বিয়ে দাও।

মায়া জিজ্ঞাসা করল, বিয়ে দাও মানে? মেয়ে পছন্দ করেছিস?

মেয়ে পছন্দ হয়ে গেলে তোমার কাছে আসব কেন?

মায়া প্রতিশ্রুতি দিল, সামনের জুনে দেশে ফিরে গিয়েই বিয়ের ব্যবস্থা করছি।

মায়া না থাকায় সুদীপ্ত মহুয়াকে নিয়ে আমার কাছেই প্রথম উঠেছিল। ওরা দুজনেই আমাকে

খুব ভালোবাসে। সময় পেলেই ওয়াশিংটন থেকে চলে আসে। আমাকেও যেতে হয়। আগে বিশেষ না গেলেও তুতুল হবার পর থেকে বেশিদিন ওকে না দেখে থাকতে পারি না। তুমি তো জান, এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায় কিন্তু ছোট্ট সংসারের নিবিড় শান্তি এখানে প্রায় স্বপ্ন। ওদের ওই তিনটি প্রাণীর ছোট্ট সংসারে গেলে আমি যেন আমার সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যাই।

সেদিন আমি নিশ্চয়ই একটু অস্বাভাবিক ছিলাম। মহুয়া সন্দেহ করেছিল আমার শরীর ঠিক নেই কিন্তু সুদীপ্ত আমার অস্বাভাবিক মনের অবস্থা ঠিকই ধরতে পেরেছিল। মহুয়াকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ও আমাকে বলল, কবিতাদি, মহুয়া আর তুতুল তোমার কাছে সপ্তাহখানেক থাকবে।

ওরা এখানে থাকলে তোর অসুবিধা হবে না?

আমার আবার কি অসুবিধে? অফিস থেকে ফিরে এসে দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে দু-এক রাউন্ড ড্রিঙ্ক করতে না করতেই সন্ধেটা বেশ কেটে যাবে।

সুদীপ্তর কথা শুনে মহুয়া আর তুতুল খুশিতে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

তারপর তুতুল দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বলল, তুমি এত গম্ভীর কেন পিসিমণি? আমার ওপর রাগ করেছ?

আমি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, আমি কি তোমার ওপর রাগ করতে পারি?

রাগ না করলে কেউ এত গম্ভীর হয়?

আমি ওর মুখের উপর মুখ রেখে বললাম, না বাবা, আমি আর গম্ভীর হব না।

জানো ভাই, সেদিন সেই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করলাম, আত্মহত্যা করে এই পৃথিবী থেকে পালিয়ে যাব না। আর কারুর জন্যে না হোক এই ছোট্ট অবোধ শিশুটির ভালোবাসার জন্য আমাকে বাঁচতেই হবে।

এখন তো ওসব কল্পনার বাইরে। এখন আমার জীবনের ভালো-মন্দর সঙ্গে তুমি এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছ যে তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমি মৃত্যুর পরও শান্তি পাব না। তাছাড়া তুমিও তো একা না। তোমার জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আরও একটি মেয়ের স্বপ্ন ও সাধনা জড়িয়ে আছে। তার স্বপ্ন ভেঙে দেবার অধিকার বা সাহস আমার নেই।

আমার মনের মধ্যে অনেক তিক্ততা, অনেক দুঃখ, বেদনার ইতিহাস, অনেক ব্যর্থতার গ্লানি চাপা থাকলেও এই পৃথিবীকে আমার নতুন করে ভালো লাগছে। বুঝতে পারছি, এই পৃথিবীর সব মানুষের মন এখনও বিষাক্ত হয়নি ; ঔদার্য ও ভালোবাসার অমৃতধারা ক্ষীণ হয়ে এলেও সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়নি।

ভাই রিপোর্টার, যে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার জন্য একদিন পাগল হয়ে উঠেছিলাম, তোমার জন্য সেই পৃথিবীকে আমার আবার ভালো লাগছে। আমি বাঁচতে চাই, আমি ভালোবাসা চাই, আমি ভালোবাসতে চাই। তাইতো পুরনো দিনের সব ইতিহাস তোমাকে জানিয়ে আমি গ্লানিমুক্ত হতে চাই। একদিন পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য সমুদ্র মন্থনে উত্থিত সমস্ত বিষ ধারণ করে মহাদেব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন আর তুমি তোমার দিদির জন্য সামান্য এইটুকু বোঝা বহন করতে পারবে না?

তোমার সুখ ও সাফল্যের জন্য যে কালো মেয়েটি তার জীবনের সবকিছু পণ করেছে, তার একটা ছবি আমাকে পাঠাবে।

তোমরা দুজনে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

তিন

আমার নিজের কথা বলার আগে আমাদের পরিবারের বিষয়ে তোমাকে কিছু বলা দরকার।

আমাদের আদিবাড়ি হুগলিতে। চন্দননগরের খুব কাছে। ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ আর ওয়াটসন সাহেব চন্দননগরের দরলেয়াঁ দুর্গ আক্রমণ করেন, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। ওই সময় আমাদের এক পূর্বপুরুষ একজন আহত ফরাসি সেনাপতিকে সেবা করে ফরাসিদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন এবং মনে হয় পরবর্তীকালে ইনি ফরাসিদের অধীনে কোনো চাকরি বা ব্যবসা শুরু করেন। এর বিষয়ে আমরা আর বিশেষ কিছু জানি না।

এই যুদ্ধের প্রায় ষাট বছর পর ইংরেজ চন্দননগরের ওপর ফরাসিদের পূর্ণ আধিপত্য স্বীকার করে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষের ভাগ্যও বদলে গেল। শুনেছি, ঈশ্বরীপ্রসাদ চৌধুরী শুধু ধনী নন, সেকালে একজন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তখনকার দিনে স্কুল-কলেজ না থাকলেও ইনি অত্যন্ত শিক্ষিত ছিলেন। ওঁর ইংরেজি জ্ঞানের কথা বলতে পারব না কিন্তু ইনি যে ফরাসি ভাষায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইনি ফরাসি ভাষায় বেশ কয়েকখানি বইও লেখেন। তার মধ্যে গঙ্গানদীর কাহিনি নিয়ে লেখা বইখানি প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় ও বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

আমি ছেলেবেলায় দাদুর কাছে এঁর সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি। দাদু বলতেন, বিশ্বাস কর দিদি, আমার দাদুর মতো সুপুরুষ ও সুপণ্ডিত খুব কম নয়। দাদু প্যারিস গেলে এক বিখ্যাত আর্টিস্ট স্বেচ্ছায় তাঁর যে ফুল সাইজ অয়েল পেন্টিং করে দেন, তার সামনে দাঁড়িয়েই আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

আমার দাদু তাঁর দাদুর কথা বলতে শুরু করলে থামতেন না। একের পর এক কাহিনি বলতেন। তারপর হঠাৎ থামতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উজ্জ্বল মুখখানা ম্লান হয়ে যেত। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, এমন একজন মহাপুরুষ তুল্য মানুষের সন্তান হয়েও বাবা কি কেলেঙ্কারিই করলেন!

আমি তখন স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ি। বয়স বেশি নয়। তাই দাদুর দুঃখের কারণটা ঠিক বুঝতাম না। তবে বেশ উপলব্ধি করতাম, দাদুর বাবা নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছিলেন, যার জন্য তাঁর এই দীর্ঘনিশ্বাস।

আস্তে আস্তে আমার বয়স বাড়ল। সবকিছু জানতে পারলাম।

ঈশ্বরপ্রসাদ মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ মারা যান।

ঈশ্বরীপ্রসাদের একমাত্র সন্তান গঙ্গাপ্রসাদ চৌধুরীর তখন বয়স মাত্র একুশ। বছর খানেক বিয়ে হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর টাকাকাড়ি বিষয় সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ বুঝে নিতেই দু-এক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমার দাদুর জন্ম হল।

প্রচুর টাকাকড়ি ও বিষয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হবার গৌরব অর্জন করার পরই গঙ্গাপ্রসাদের রূপান্তর শুরু হল। প্রথমে লুকিয়ে, তারপর প্রকাশ্যে। শেষ পর্যন্ত সেদিন উনি এক ফরাসি সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে হাজির হয়ে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সামনে তাকে চুম্বন করে সগর্বে ঘোষণা করলেন, মাই বিলাভেড নিউ ওয়াইফ, সেদিন সেই মুহূর্তেই গঙ্গাপ্রসাদের স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে ওই প্রসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন আমার দাদুর বয়স মাত্র বারো-তেরো।

কয়েক বছর এখানে ওখানে কাটাবার পর দাদু স্টীমার কোম্পানির বুকিং ক্লার্কের চাকরি নিয়ে প্রথমে চাঁদপুর, পরে গোয়ালন্দ এলেন।

আমরা হুগলির লোক হলেও ঢাকার বাসিন্দা হয়ে গেলাম।

আর গঙ্গাপ্রসাদ? তিনি হুগলি আর চন্দননগরের সব বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে ওই ফরাসি সুন্দরীকে নিয়ে প্যারিস চলে যান এবং বছর দশেক পরে ওখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঢাকাতেই আমার জন্ম। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হবার পর দাদুকে স্টীমার কোম্পানির চাকরি করতে দেখিনি। শুনেছি আমার জন্মের দিনই দাদু একটা লঞ্চ কেনেন এবং তাই সে লঞ্চের নাম দেন দিদি।

ছেলেবেলার সেই ক'টা বছরের স্মৃতি কোনোদিন ভুলব না। বাবা মা বা দিদার চাইতে দাদুর সঙ্গেই আমার বেশি ভাব ছিল। আমার খাওয়া-শোয়া, ওঠা-বসা সবকিছুই দাদুর সঙ্গে ছিল। অনেক আগেকার কথা হলেও আমার বেশ মনে পড়ে, রোজ বিকেলবেলায় আমি সদরঘাটে যেতাম। দূর থেকে যাত্রী বোঝাই আমাদের লঞ্চ দেখেই দাদু বলতেন, দ্যাখ দিদি, তোর লঞ্চ আসছে। আমি আনন্দে, খুশিতে নাচতে শুরু করতাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লঞ্চ সদরঘাটে আসত। যাত্রীরা নেমে যাবার পর দাদু আমাকে নিয়ে লঞ্চে উঠতেই গিয়াসুদ্দীন চাচা আমাকে কাঁধে তুলে নিতেন। আমার এখনও বেশ মনে আছে, উনি রোজ আমার জন্য কিছু আনবেনই। কোনোদিন মিষ্টি, কোনোদিন ফল বা লজেন্স। আমি তখন বুঝলাম না গিয়াসুদ্দীন চাচা আমাকে কেন অত ভালোবাসতেন কিন্তু পরে জেনেছিলাম।

তখন আমি একটু বড় হয়েছি। বোধহয় ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ি। কোনোদিন কোনো কারণে দাদুর সঙ্গে সদরঘাটে যেতে না পারলে গিয়াসুদ্দীন চাচা আমাদের বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেনই।

দিদি, তোমার লঞ্চ চালিয়ে পেট চালাই। তাইতো ডাঙ্গায় নেমে তোমার মুখখানা না দেখে ঘরে ফিরতে পারি না।

আমি হাসি।

গিয়াসুদ্দীন চাচা হাসেন না। গম্ভীর হয়ে বলেন, না, না, দিদি, হাসির কথা নয়। তোমাকে দেখলে আমার পোড়া বুকখানা জুড়িয়ে যায়।

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না কিন্তু বেশ বুঝতে পারতাম, গিয়াসুদ্দীন চাচার মনে অনেক দুঃখ। আর বুঝতাম, উনি আমাকে সত্যি ভালোবাসেন।

তুমি কলকাতার ছেলে। পূর্ব বাংলায় যাওনি। বর্ষকালে পূর্ববাংলার রূপ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সেই বর্ষা-বাদলের দিনেও গিয়াসুদ্দীন চাচা আমাকে দেখতে আসবেনই।

আমি হয়তো বলতাম, চাচা, এই বর্ষায় কেউ আসে?

গিয়াসুদ্দীন চাচা একমুখ হাসি হেসে জবাব দিতেন, সেই অঘ্রাণের আগে তো বর্ষা থামবে না। তাই বলে কি এই ক'মাস তোমার মুখখানা দেখব না?

দাদু আমাকে বলেছিলেন, গিয়াসুদ্দীন চাচার একমাত্র মেয়ে কলেরায় মারা যায় এবং পরের বছর ওর জন্মদিনেই আমার জন্ম হয়।

সেই সে সময় আমি স্কুলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় একটা বই পুরস্কার পাই। দাদুর কাছে সে খবর শুনে গিয়াসুদ্দীন চাচার কি আনন্দ! হাতে সময় থাকলেই বলতেন, দিদি, আমাকে একবার 'কাজলাদিদি' কবিতাটা শুনিয়ে দাও তো—যেটার জন্য তুমি মেডেল পেয়েছ।

গিয়াসুদ্দীন চাচার প্রশংসায় আমি এমনই উৎসাহিত হয়েছিলাম যে যখন-তখন যাকে-তাকে 'কাজলাদিদি' কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতাম। ওই এক কবিতা হাজার বার শুনতে শুনতে বাড়ির সবাই পাগল হয়ে যেতেন কিন্তু গিয়াসুদ্দীন চাচার কথা মনে করে আমি মা বা দিদার হাসাহাসিকেও গ্রাহ্য করতাম না।

তারপর একদিন সদরঘাটে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরও আমাদের লঞ্চ এলো না। আস্তে আস্তে রাত হল। রাতের পাতলা অন্ধকার গাঢ় হল, কিন্তু গিয়াসুদ্দীন চাচা লঞ্চ নিয়ে ফিরলেন না। অনেক রাত্রে সর্বনাশের খবর এলো। আমি আর জীবনে কোনোদিন 'কাজলাদিদি' কবিতা আবৃত্তি করতে পারলাম না।

এরপর মাস খানেক বিছানায় শুয়েই দাদু বেঁচে ছিলেন। তারপর তিনিও চলে গেলেন। বছরখানেক ঘুরতে না ঘুরতেই দিদাও দাদুর কাছে চলে গেলেন।

আমার ছোট দুনিয়া হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল।

আমার দাদু নিজে বিশেষ লেখাপড়া করতে পারেননি বলে বাবাকে এম. এ. বি এল. পর্যন্ত পড়ান। একে দাদু দিদার মৃত্যু তারপর ঢাকা কোর্টে ওকালতি করে বিশেষ সুবিধে না হওয়ায় বাবা ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। আসার পর জানলাম মার ক্যান্সার হয়েছে এবং তাঁর চিকিৎসার জন্যই বাবা ঢাকা ছেড়ে কলকাতা এসেছেন।

কলকাতায় আসার পর প্রায় বছর দুই মা মোটামুটি ভালোই ছিলেন। নিজেই সংসারের কাজকর্ম করতেন। আমি স্কুল থেকে ফিরলে ঘণ্টাখানেক গল্প করবেনই। তারপর বাবা কোর্ট থেকে ফিরলেই বলতেন, অমন করে তাকিয়ে দেখার কোনো কারণ হয়নি। আমি ভালোই আছি।

বাবা তাঁর সমস্ত উৎকণ্ঠা লুকিয়ে হাসি মুখে বলতেন, ভালো থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই ভালো থাকবে।

আমার বাবা অত্যন্ত সৎ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি আপন মনে নিজের কাজকর্ম-লেখাপড়া করতেন। তাইতো দাদু বাবাকে ব্যবসা-বাণিজ্যে না টেনে স্বাধীন পেশায় দেন, কিন্তু অমন লাজুক লোকের পক্ষে ওকালতিতেও সুবিধে করা সহজ নয়। বাবাকে কোনোদিন তাস-পাশা খেলতে বা কোথাও কারুর সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখিনি। কোর্টে যাওয়া-আসা ছাড়া সবই সময়ই নিজের ঘরে বসে পড়াশুনা করতেন। দাদু থাকতে আমি বাবার কাছে যেতাম না, কিন্তু কলকাতায় আসার পর আমাদের সবকিছু বদলে গেল। বাবার কাজকর্মের চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেলেও বাবা আমার অনেক কাছের মানুষ হলেন।

গিয়াসুদ্দীন চাচা আর দাদুকে হারানোর পর এই পৃথিবীকে আমার মরুভূমি মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম ওই ক্ষণস্থায়ী সুখের স্মৃতি রোমন্থন করেই আমাকে বাকি জীবন কাটাতে হবে, কিন্তু না, কলকাতায় আসার পর অসুস্থ মা আর কর্মব্যস্ত বাবা আমাকে স্নেহ-ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেন। আমার পৃথিবী আবার সবুজ, সুন্দর হয়ে উঠল।

আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

চার

কলকাতা আসার মাস ছয়েক পরের কথা। সেদিন বাবার কোর্ট বন্ধ হলেও আমার স্কুল খোলা ছিল। আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই দেখি বাবা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা, বাবা কার সঙ্গে অত গল্প করছেন?

মা হেসে বললেন, উনি ওর বন্ধু।

বাবার বন্ধু! আমি অবাক হয়ে বললাম।

হ্যাঁ। ওরা একসঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে ল' পড়তেন।

এর আগে কী উনি আমাদের এখানে এসেছেন?

না। আজ ডাঃ রায়ের ওখানে হঠাৎ দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে।

বাবার বন্ধুর কি নাম?

হেমন্ত মজুমদার।

উনিও কি প্র্যাকটিস করেন?

না। উনি একটা সাহেবী কোম্পানিতে ভালো চাকরি করেন।

তুমি ওকে আগে থেকেই চিনতে?

আমার বিয়ের পরই একবার শিয়ালদা দেখা হয়েছিল।

আমি স্কুলের কাপড়-চোপড় ছেড়ে খেতে বসলে মা বললেন, তোর বাবার কাছে শুনেছি হেমন্তবাবু খুব আমুদে লোক। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সারা ক্লাসের ছেলেদের জমিয়ে রাখতেন। আজ দেখে মনে হল, উনি সেই রকমই আছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি থাকেন কোথায়?

বোধহয় এলগিন রোডের কাছাকাছি। একটু থেমে মা প্রায় আপন মনেই বললেন, ভদ্রলোক বিয়ে-টিয়ে না করে বেশ কাটিয়ে দিলেন।

খেয়ে-দেয়ে আমি আমার ঘরে যেতে না যেতেই বাবা ডেকে পাঠালেন। গেলাম। বাবা বললেন, আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম...

হেমন্তবাবু আমার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, এ ব্যাচেলার কাকু তোমারও বন্ধু।

আমি একটু নীচু হয়ে ওকে প্রণাম করতে যেতেই উনি তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, থাক, থাক, ও সব ফর্মালিটির দরকার নেই।

সেদিন কিছুক্ষণ গল্পগুজব করেই উনি চলে গেলেন। এর পর থেকে উনি মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। কখনও কখনও আমাকে নিয়ে এদিক-ওদিক বেড়াতেও যেতেন। সত্যি হেমন্তকাকুকে বেশ লাগত। ওরা একটা ছোট্ট মরিস এইট গাড়ি ছিল। স্কুলের গণ্ডী পেরুবার আগেই আমি ওর উৎসাহে গাড়ি চালানো শিখি। সত্যি, সেদিনের উত্তেজনার কথা ভুলব না। মনে হল হেমন্তকাকু যেন আমার হাতে আকাশের চাঁদ এনে দিলেন।

পরের বছর আমি কলেজে ভর্তি হবার পরই হেমন্তকাকু একদিন বার মা'র সামনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল কবিতা, কি চাই?

কী আর চাইব!

না, না, কিছু চাইতেই হবে।

অনেকবার বলার পরও যখন আমি কিছু বললাম না, তখন উনি বললেন, চল, তোমাকে পুরী ঘুরিয়ে আনি।

আমি কিছু বলার আগেই বাবা বললেন, আমিও ভাবছিলাম সবাইকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি কিন্তু ডাক্তার বারণ করছেন বলে বেরুতে পারছি না।

সঙ্গে সঙ্গে মা বললেন, আমরা যখন যেতে পারছি না তখন খুকি বরং ওর কাকুর সঙ্গে ঘুরে আসুক।

বাবা বললেন, তাতে আমার কি আপত্তি?

হেমন্তকাকু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, গাড়িতে যাবে? নাকি ট্রেনে?

মা বললেন, না, না, গাড়িতে অত দূর যেতে হবে না।

দিন কয়েক পর আমি হেমন্তকাকুর সঙ্গে পুরী রওনা হলাম। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখি ফার্স্ট ক্লাস ক্যুপে রিজার্ভ করা রয়েছে। মালপত্র রাখার পরই উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কবিতা, ঠিক আছে তো?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমার কাকুর প্ল্যানিং-এ কী কোনো ত্রুটি থাকতে পারে?

উনি হাসতে হাসতে বললেন, আমি শুধু তোমার কাকু না, বাট অলসো ইওর ফ্রেন্ড।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানালাম, দ্যাট্স রাইট।

ট্রেন ছাড়ার তখনও দেরি ছিল। উনি বললেন, তুমি বস, আমি আসছি।

পনেরো বিশ মিনিট পরেই উনি দুটো সোডার বোতল নিয়ে আসতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কী দু' বোতল সোডা দিয়ে কী করবেন?

একটু চাপা হাসি হেসে হেমন্তকাকু বললেন, কেন? দুজনে খাব।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমার কি অম্বল হয়েছে যে সোডা খাব?

হেমন্তকাকু আর কিছু না বলে বাথরুম থেকে জামা-কাপড় বদলে নীচের বার্থে আমার বিছানা পেতে দিলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী শাড়ি-টাড়ি বদলে নেবে?

হ্যাঁ।

তাহলে যাও। বাথরুম থেকে ঘুরে এসো।

আমি বাথরুম থেকে আসতে আসতেই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কাকু আমার হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললেন, এবার বস। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাক।

বসলাম।

এবার উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী এই প্রথম পুরী যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

তোমার সমুদ্র ভালো লাগে, না পাহাড়?

দু-ই, কিন্তু কোনোটাই দেখা হয়নি।

ঠিক আছে। এরপর তোমাকে নিয়ে দার্জিলিং বা সিমলা যাব।

আপনি খুব ঘুরে বেড়ান, তাই না কাকু?

উনি একটু হেসে আমার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বললেন, হাজার হোক ব্যাচেলার। সংসার-টংসারের ঝুট-ঝামেলা তো নেই। তাই সুযোগ পেলেই কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ি।

সংসারের ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়াই ভালো।

সে কী? তুমিও কী বিয়ে করবে না?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, বিয়ে-টিয়ে করা আমার একটুও ভালো লাগে না।

তাহলে কি করবে?

কী আর করব? পড়াশুনা করার পর চাকরি করব।

একলা একলা থাকবে?

একলা থাকব কেন! বাবা মা'র সঙ্গে থাকব।

কিন্তু বাবা মা তো চিরকাল থাকবেন না।

তখন আর কি করব? একলাই থাকব।

বিয়ে না করে থাকতে পারবে?

খুব পারব।

উনি একবার ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে হয় না তুমি বিয়ে না করে থাকতে পারবে।

আমি একটু অবাক হয়ে কাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, পারব না কেন?

উনি হাসতে হাসতে আমাকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের পক্ষে বিয়ে না করে থাকা খুব মুশকিলের।

আমি সুন্দরী?

কাকু চোখ দুটো বড় করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সুন্দরী না?

মোটেও না।

একশোবার, হাজারবার তুমি সুন্দরী।

আপনার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

এ ব্যাপারে তর্ক না করাই ভালো।

কিন্তু সুন্দরী হলেই যে বিয়ে করতে হবে, এমন কোনো কারণ নেই।

কাকু চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, কারণ আছে।

কী কারণ?

ছেলেদের উৎপাতে পাগল হয়ে যাবে!

আমি লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, আমাকে কেউ উৎপাত করবে না।

ঠিক আছে। দেখা যাবে আমি ঠিক নাকি তুমি ঠিক।

দেখবেন।

কাকু হঠাৎ নেমে দাঁড়িয়েই বললেন, এবার শুরু করা যাক, কি বল?

কি শুরু করা যাক?

একটু আনন্দ।

আনন্দ? আমি অবাক হয়ে ওর দিকেই তাকাই।

হেমন্তকাকু অত্যন্ত সহজ ভাবে বললেন, দুজনে বেড়াতে যাচ্ছি একটু হুইস্কি খাব না?

মদ। আমি প্রথম চমকে উঠলাম।

উনি দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা তুলে ধরে বললেন, সারা পৃথিবীর লোক হুইস্কি খায়। হুইস্কি খাওয়া অন্যায় নয়, কিন্তু মাতাল হওয়া অন্যায়।

কিন্তু মদ খেলেই তো লোকে মাতাল হয়।

ডোন্ট সে মদ, সে হুইস্কি।

হুইস্কি খেলেও তো মাতাল হবে।

কোনো জিনিসই বেশি খাওয়া ভালো নয়। যে কোনো জিনিস বেশি খেলেই শরীর খারাপ হয়, তাই না?

হ্যাঁ।

বেশি হুইস্কি খাওয়াও খারাপ। প্রথম কথা মাতাল হবে, দ্বিতীয় কথা শরীর খারাপ হবে।

কিন্তু নেশা কি কেউ হিসেব করে করতে পারে?

সব ভদ্র শিক্ষিত লোকেই পারে।

আমি এবার দৃষ্টিটা নীচের দিকে করে নিজের মনে মনে ওর কথাগুলো ভাবি। দু এক মিনিট নিজের মনে মনেই তর্ক করি কিন্তু ঠিক মেনে নিতে পারি না।

এবার উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাবছ, কবিতা?

বিশেষ কিছু না।

আমার হুইস্কি খাবার কথা ভাবছ?

এবার আমি ওর দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা কাকু, আপনি হুইস্কি খান?

উনি মাথা নেড়ে বললেন, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার আগে একটু খাই।

রোজ?

হ্যাঁ।

খাওয়া দাওয়ার আগে কেন খান?

তাতে শরীর ভালো হয়।

এবার আমি আবার ভাবি। কোনো প্রশ্ন করি না, কিন্তু উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনোদিন আমাকে মাতাল হতে দেখেছ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না।

উনি এবার হাসতে হাসতে বললেন, আজ তো তুমিও একটু হুইস্কি খাবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললাম, না না, কাকু, আমি ও সব খাব না।

উনি আবার দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বললেন, আচ্ছা পাগলি মেয়ে! হুইস্কি খাবার নাম শুনেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়।

আমি একটু হেসে বললাম, মদ খেলে আমি মরেই যাব।

আর যদি না মরে যাও, তাহলে...

তাহলে মাতাল হব।

যদি মাতাল না হও।

তাহলে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাব।

যদি তা-ও না হও?

মোট কথা, মারাত্মক কিছু হবেই।

কিছু মারাত্মক হবে না।

তবে কি মদ খাবার পরও আমি স্বাভাবিক থাকব?

একশোবার স্বাভাবিক থাকবে।

তাহলে মদ খেয়ে লাভ?

মনটা খুশিতে ভরে যাবে।

হেমন্তকাকু আর কথা না বলে হুইস্কির বোতল, ফ্লাস্ক, গ্লাস, সোডার বোতল নিয়ে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি একটু খাই?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম।

তোমার আপত্তি থাকলে আমি বাইরের প্যাসেজে দাঁড়িয়ে খেয়ে আসছি।

না, না, আপনি বাইরে যাবেন কেন? অসুবিধে হলে আমিই একটু বাইরে দাঁড়াব।

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? তোমাকে বাইরে রেখে আমি এখানে বসে বসে ড্রিঙ্ক করব?

আমি বাইরে যাবই, তা তো বলছি না।

উনি একটা গ্লাসে হুইস্কি আর সোডা মিশিয়ে আমার মুখের সামনে ধরে বললেন, চিয়ার্স! ফর আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ!

কাকু গ্লাসে চুমুক দিতেই আমি স্তম্ভিত হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পাঁচ

এর আগের চিঠিটা পড়ে নিশ্চয়ই মনে হয়েছে, সে রাত্রে ট্রেনের মধ্যে একটা কেলেঙ্কারি হয়েছিল। না, সে রকম কিছু হয়নি। তবে দু' পেগ খাবার পরই কাকু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কবিতা আমি কি মাতাল হয়েছি?

আমি বিজ্ঞের মতো গম্ভীর হয়ে বললাম, কোনো ভদ্র-শিক্ষিত লোক মাতাল হয় না। আমার কথা শুনে কাকু হো হো করে হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর হুইস্কির গেলাসটা আমার মুখের সামনে ধরলেন, তুমি একটু খাবে না?

না কাকু, প্লিজ?

কেন? ভয় কী?

ভয় কেন করবে? ইচ্ছে করছে না।

ইচ্ছে করছে না বোলো না। কিছুটা ভয় আর কিছুটা সঙ্কোচের জন্যই তুমি খাচ্ছ না।

কোনো ব্যাপারেই আমার ভয় বা সঙ্কোচ নেই।

কাকু মিট মিট করে হাসতে হাসতে বললেন, বিশ্বাস করি না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সময় এলেই প্রমাণ পাবেন।

কাকু গেলাসের বাকি হুইস্কিটা একবারে গলায় ঢেলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না।

একশোবার আপনাকে ভালোবাসি।

কিন্তু তার তো কোনো প্রমাণ পাচ্ছি না।

শুধু হুইস্কি খেলেই বুঝি আপনি তার প্রমাণ পাবেন?

তা বলছি না ; তবে যদি ভালোবাসতে তাহলে এতবার অনুরোধ করার পর নিশ্চয়ই অন্তত এক পেগ খেতে।

তারপর হুইস্কি খেয়ে যদি মাতাল হই?

এমন ভাবে খাবে যাতে নেশা হবে না কিন্তু মৌজ হবে।

ঠিক আছে, জানা থাকল।

বেশি দিন নয়, মাত্র তিন দিন আমরা পুরী ছিলাম। সত্যি বলছি ভাই, এর আগে এমন আনন্দ কখনও হয়নি। হেমন্তকাকু বয়সে অনেক বড় হলেও সত্যি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলেন।

কলকাতা ফেরার পর আমাকে আনন্দে, খুশিতে ভরপুর দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, খুব আনন্দ করেছিস, তাই না?

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, হ্যাঁ মা। খুব আনন্দ করেছি।

খুব ঘুরেছিস?

খুব ঘুরেছি, খুব খেয়েছি, খুব সাঁতার কেটেছি, খুব ঘুমিয়েছি, খুব মজা করেছি।

কিছু আর বাকি রাখিসনি।

হেমন্তকাকু বাবাকে বললেন, তোর চাইতে তোর মেয়ের সঙ্গে আমার বেশি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, বিয়ে-টিয়ে যখন করলি না তখন আমার মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই জীবনটা কাটিয়ে দে।

মার জন্য বাবা কোর্টে ছাড়া কোথাও বেরুতেন না। সব সময় বাড়িতেই থাকতেন। তাই আমি মাঝে মাঝে কাকুর সঙ্গে কলকাতার মধ্যে এদিক ওদিক বা সিনেমা থিয়েটারে যেতাম। কখনও কখনও ছুটির দিন আমি কাকুর ফ্ল্যাটেই সারাদিন কাটাতাম। মাঝে মাঝে আমার দু-একজন বন্ধুও কাকুর ওখানে যেতো। তারপর হয়তো আমরা সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে বা সিনেমা দেখতে যেতাম।

তারপর মার শরীর খারাপ হতে শুরু করল। মাঝে মাঝেই কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি বাবা কোর্টে যাননি। মার বিছানার ধারেই বসে আছেন। আমিও মার পাশে বসি। মার মাথায়, বুকে হাত বুলিয়ে দিই। মা বলেন, তুই চান-টান করে আয়।

আমি বলি, একটু পরে যাব।

মা আমার হাত দুটো নিজের দুর্বল হাতের মধ্যে নিয়ে বলেন, না মা, যা। অনিয়ম করলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। মা একসঙ্গে বেশি কথা বলতে পারতেন না বলে একটু থেমে বলতেন, আমি অসুস্থ হয়েছি বলে তোরা কেন অনিয়ম করবি? আমি আর কোনো কথা না বলে উঠে যেতাম।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি বাবা চুপচাপ নিজের ঘরে বসে আছেন। আমাকে দেখেই একবার আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম জলভরা ভাদ্দরে মেঘের মতো দুটো চোখ টল টল করছে। আমি যেন সহ্য করতে পারলাম না। বেরিয়ে এলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাকে ডাকলেন, খুকি মা, শুনে যা।

আমি কাছে যেতেই বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর মাথা রেখে অসহায় ছোট বাচ্চার মতো কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তোর মা চলে গেলে আমরা কি করে বাঁচব রে খুকি? এই পৃথিবীতে আমার তো আর কোনো বন্ধু নেই।

ভাই রিপোর্টার, সে দুঃখের দিনের কথা এত বছর পরও লিখতে গিয়ে আমার দু'চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। বাবার শৈশব-কৈশোর আমি দেখিনি। তার প্রথম যৌবনের খবরও আমি জানি না, কিন্তু আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হবার পর থেকেই দেখেছি মা ছাড়া বাবা এই পৃথিবীর আর কিছু চিনতেন না, জানতেন না। বাবা মাকে শুধু ভালোবাসতেন না, যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করতেন। আমার বেশ মনে পড়ে কলকাতায় আসার পর বাবা একদিন আমাকে বলেছিলেন, জন্ম জন্ম তপস্যা করার ফলেই তোর মাকে আমি স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি। বাইরের লোক ওর রূপ দেখে স্তম্ভিত হয় কিন্তু ওর গুণের কাছে রূপ কিছুই না।

মা এমনই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন যে বাবা সর্বস্ব কিছু পণ করেও তাঁকে বাঁচাতে

পারলেন না। মা চলে গেলেন। আমি তখনই জানতাম, বাবা এই আঘাত সহ্য করতে পারবেন না। আমার বি. এ. পরীক্ষা শেষ হবার দিন তিনেক পরেই বাবার হার্ট অ্যাটাক হল। বাহাত্তর ঘণ্টা পার হবার পর হেমন্তকাকু বললেন, আর ভয় নেই। বিপদ কেটে গেছে।

আমার অদৃষ্টের মহাকাশে মুহূর্তের জন্য সূর্য উঁকি দিলেও আবার সঙ্গে সঙ্গে মেঘে ঢাকা পড়ল। বাবাও চলে গেলেন।

সে-সব দিনের কথা বেশি লিখে তোমার মনে দুঃখ দেব না। তুমি সহজেই আমার অবস্থা বুঝতে পারছ। আমি ভাবতে পারিনি এমন অকস্মাৎ আমার জীবনের সব আলো নিভে যাবে। হেমন্তকাকুর বিরুদ্ধে আমার অনেক অভিযোগ কিন্তু তা সত্ত্বেও মুক্তকণ্ঠে বলব, সেই অন্ধকার অমানিশার রাত্রিতে আর কোনো আত্মীয় বন্ধু নয়, শুধু উনিই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

কাকু আমাকে বললেন, ডোন্ট ফরগেট কবিতা, আমি এখনও বেঁচে আছি। তোমার কিছু ভাবতে হবে না। তুমি এম. এ. পাশ কর, ডক্টরেট হও ; তারপর ভেবে দেখা যাবে।

সত্যি আমাকে কিছু ভাবতে হল না। আমাদের কালীঘাটের বাড়িটা পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি করলেন। ফার্নিচার আর বাবার আইনের বই-পত্তর বাবার জুনিয়ারকে দেওয়া হল। আমি কাকুর দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটে চলে গেলাম।

কাকুর ফ্ল্যাটে একটা ড্রইংরুম, একটা বেড রুম, বেডরুমের সঙ্গেই বাথরুম আর ছোট একটা স্টাডি। এ ছাড়া একটা কিচেন। কাকুর সংসার-ধর্মের ভার সালাউদ্দিন নামে একজন খানসামা-কাম-বাবুর্চির উপর। ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গার সময় কাকু সালাউদ্দিনকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। তারপর থেকেই সালাউদ্দিন স্বেচ্ছায় কাকুর সংসারের ভার নিয়েছে। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে সালাউদ্দিন যখন আসে তখন কাকু ঘুমিয়ে থাকেন। ওর হাতের চা খেয়েই কাকুর ঘুম ভাঙে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে কাকু অফিস যান। আবার লাঞ্চের সময় আসেন। রাত্রের রান্না ফ্রিজে রেখে সালাউদ্দিন আড়াইটে তিনটে নাগাদ চলে যায়। শুধু রান্নাবান্না নয়, কাকুর সংসারের সব কিছু দায়িত্বই ওর। বাজার হাট, জামা কাপড়, বিছানা বালিশ, মোটর গাড়ির তদারকি ছাড়াও হুইস্কি সোডা এনে রাখার দায়িত্বও এই সালাউদ্দিনের।

কাকুর বেডরুমটা বেশ বড়। সুতরাং সে ঘরের এক পাশে আমার খাট আর একটা আলমারি রাখায় কারুরই কোনো অসুবিধে হল না। কাকুর ঘরেই শোবার ব্যাপারে একবার যে মনে খটকা লাগেনি, তা নয় ; তবে প্রথম কথা আর কোনো শোবার ঘর ছিল না, আর দ্বিতীয় কথা, যার স্নেহ অবলম্বন করে আমি এখানে এলাম, তাঁকে অবিশ্বাস করা অন্যায়। পাশের স্টাডিটা আমিই নিলাম। ওখানেই পড়াশুনা করব।

তারপর একদিন কাকু নিজে আমাকে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে এম এ'তে ভর্তি করে দিলেন আর বললেন, এতোদিনে নিশ্চয়ই আমাকে চিনেছ। ট্রিট মি অ্যাজ এ রিয়েল ফ্রেন্ড, কোনো ব্যাপারে দ্বিধা করবে না।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি আপনার ফ্ল্যাটে থাকছি বলে আপনিও কোনো ব্যাপারে দ্বিধা করবেন না।

কাকু বললেন, সন্ধের পর দু এক পেগ হুইস্কি খাই, তা তো তুমি জানো। সুতরাং আর কোনো ব্যাপারে তো আমার দ্বিধা হবার কোনো কারণ নেই।

হুইস্কি খাবার কথা বলছি না। আপনার জীবনধারণের অন্য কোনো ব্যাপারেও দ্বিধা করবেন না।

না, না, কোনো ব্যাপারেই দ্বিধা সঙ্কোচ নেই।

আমার নতুন জীবন বেশ ভালো ভাবেই শুরু হল। সালাউদ্দিন আসার আগেই উঠে পড়ি। স্নান সেরে বেরুতেই সালাউদ্দিন আসে। চা খাই। কারুর সঙ্গে একটু কথা বলি। খবরের কাগজ পড়ি। তারপর একটু পড়াশুনা করি। পড়াশুনা করতে করতেই সামান্য কিছু খাই। তারপর কাকু অফিস বেরিয়ে যাবার পরই খেতে বসি! খেয়ে দেয়েই ইউনিভার্সিটি। বেরুবার সময় সালাউদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করি, চাচা, কিছু আনতে হবে?

এমনি কিছু আনতে হবে না, তবে সাহেবের গেঞ্জি কিনে আনলে ভালো হয়।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে কাকুর জন্য চারটে গেঞ্জি কিনেই বাড়ি আসি। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে কোনো দিন সালাউদ্দিনের দেখা পাই, কোনোদিন পাই না। একটু বিশ্রাম করি। হয়তো কোনো পত্র পত্রিকা একটু উল্টে দেখি। কোনো কোনোদিন দু-একজন বান্ধবী এসেও হাজির হয়। সবাই মিলে আড্ডা দিই, চা-টা খাই।

এর মধ্যে টেলিফোন বেজে ওঠে।

হ্যালো! কে কাকু!

কী করছ?

সুপর্ণা আর আরতি এসেছে। ওদের সঙ্গে গল্প করছি।

নো বয় ফ্রেন্ড?

আমি হাসতে হাসতে বলি, নো দেয়ার ইজ নো বয় ফ্রেন্ড।

আমার সব বান্ধবীদের সঙ্গেই কাকুর খুব ভাব। আমার কথা শুনেই ওরা বুঝতে পারে, কাকুর ফোন। আরতি তাড়াতাড়ি উঠে এসে রিসিভারের সামনে মুখ দিয়ে বলে, কাকু, সিনেমা দেখাবেন না?

কাকু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কে সিনেমা দেখার কথা বলল?

আমি বললাম, আরতি।

আর কেউ আছে?

সুপর্ণাও আছে।

ওদের বলে দাও রবিবার দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবে ও সিনেমা দেখবে।

এ রকম আনন্দ, হৈ-হুল্লোড় আমরা মাঝে মাঝেই করি। কখনও কখনও ছুটির দিনে আমি আর কাকু কোথাও আশে-পাশে ঘুরে আসি।

যাই হোক ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে আমি আর কোথাও যাই না। একটু বিশ্রাম করে দু-এক ঘণ্টা পড়াশুনা করি। কাকু অফিস থেকে বেরিয়ে অফিসের কাজে সলিসিটার অ্যাডভোকেটদের চেম্বার ঘুরে সাড়ে সাতটা আটটায় বাড়ি ফিরলেই আমি চা-টা দিই। একটু গল্প করি। তারপর উনি স্নান করতে গেলে আমি কোনো কোনোদিন সামান্য কিছু রান্নাবান্না করি।

এরপর কাকুর ড্রিঙ্ক করার পালা। এখন আর কাকুকে কিছু করতে হয় না। আমিই বোতল থেকে গেলাসে হুইস্কি ঢালি, সোডা মিশিয়ে ওকে দিই। ওকে সাহচর্য দেবার জন্য আমিও এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াস বা অন্য কোনো সফ্‌ট্ ডিঙ্ক নিই। তারপর কাকু হুইস্কির গেলাসটা একটু উঁচু করে ধরে বলেন, চিয়ার্স। ফর আওয়ার লাস্টিং ফ্রেন্ডশিপ!

আমি মাথা নত করে হাসি মুখে কাকুর শুভ কামনা গ্রহণ করি।

দু-এক ঘণ্টা সময় কেটে যায়।

তারপর আমরা খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ি।

এইভাবেই দিনগুলো বেশ কাটছিল। দেখতে দেখতে ক'টা মাস পার হয়ে গেল।

সেদিন কাকুর জন্মদিন। কাকু অফিস থেকে ফিরেই আমার হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন, আজ তুমি এই শাড়িটা পরলে আমি খুব খুশি হব।

নিশ্চয়ই পরবো।

এখুনি পরে এসো।

স্ট্যাডিতে গিয়ে প্যাকেট খুলে দেখি, বেশ দামি মাইসোর সিল্কের শাড়ি। পরলাম। তারপর আমার কিনে আনা উপহারটা কাকুকে দিয়ে প্রণাম করতেই উনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, এ বটল অফ্ স্কচ! লাভলি!

আমি ওকে প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই উনি দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে কপালে স্নেহচুম্বন দিয়ে বললেন, গড ব্লেস ইউ।

তারপর কাকু স্নান করে আসতেই ওর গেলাসে নতুন স্কচের বোতল থেকে হুইস্কি ঢালতেই উনি দু'হাত ধরে বললেন, কবিতা, আজ আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

বলুন কি অনুরোধ?

আজ আমার সঙ্গে তোমাকেও একটু ড্রিঙ্ক করতে হবে।

এই পৃথিবীর সমস্ত আপনজনকে হারাবার পর যার স্নেহচ্ছায়ায় আমি আশ্রয় পেয়েছি, সেই কাকুর জন্মদিনে আমি কিছুতেই তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। বললাম, করব।

কাকু নিজেই দুটো গেলাসে হুইস্কি-সোডা ঢেলে আমার হাতে একটা গেলাস তুলে দিতেই আমি বললাম, চিয়ার্স!

চিয়ার্স!

গেলাসে এক চুমুক দিয়েই বললাম, এ এমন কি মধু যে আপনি রোজ রোজ খান?

আস্তে আস্তে একটু একটু করে খাও। দেখবে কি ভালো লাগছে।

ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় এক পেগ শেষ করেই আমি দুজনের খাবার নিলাম। কাকু আবার দুটো গেলাস ভরে ডাইনিং টেবিলে আসতেই আমি বললাম, আবার!

আজ আমাকে দুঃখ দিও না কবিতা।

কথায় বলে, লোকে অনুরোধে ঢেঁকি গেলে। আমিও কারুর অনুরোধে সেদিন দু' পেগ হুইস্কি খেলাম। খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওই নতুন মাইসোর সিল্কের শাড়ি পরেই আমি শুয়ে পড়লাম।

তখন কত রাত জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি, কাকু আল্‌তো করে আমার বুকের ওপর হাত রেখে আমার পাশে অসহায় শিশুর মতো অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলেও কিছুটা নেশার ঘোরে, কিছুটা ঘুমের ঘোরে আমি ওকে কিছুই বলতে পারলাম না। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ছয়

পরের দিন ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই কাকুকে আর আমার পাশে দেখলাম না। দেখি, উনি ওর বিছানাতেই ঘুমুচ্ছেন। মনে মনে ভাবলাম, হয়তো নেশার ঘোরে আমার পাশে শুয়েছিলেন। তারপর নেশা কেটে যাবার পর ভোর রাত্রের দিকে হয়তো ঘুম ভাঙতেই উনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমার পাশ থেকে নিজের বিছানায় চলে যান। তাই কাকুকে অপরাধী ভাবতে পারলাম না।

এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করব। কাকু যখন আমাকে জড়িয়ে শুয়েছিলেন, তখন আমার খারাপ লাগেনি ; বরং একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের স্বাদ পেয়ে ভালোই লেগেছিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা স্বীকার করবে না কিন্তু এ সব কথা সর্বৈব সত্য যে যৌবনে পুরুষের স্পর্শ মেয়েদের ভালোই লাগে। বিশেষ করে সে পুরুষ যদি ঘৃণার পাত্র না হয়, তাহলে খারাপ লাগার কোনো প্রশ্নই নেই।

দিনগুলো আগের মতোই কেটে যাচ্ছে। কাকুর ব্যবহারে মুহূর্তের জন্যও কোনো অমার্জিত ভাব দেখতে পাই না। মনে মনে ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। তারপর আবার একদিন মাঝরাত্রে কাকুকে আমার পাশে আবিষ্কার করলাম। সেদিন আমি নেশা করিনি। ঘুম ভাঙতেই সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম না। দেখি, আগের দিনের মতোই উনি আমার বুকের পর আলতো করে হাত রেখে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। আমি আস্তে ওর হাতটা সরাতেই উনি আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। আমি অনেকক্ষণ জেগে জেগে আবছা আলোয় ওর দিকে চেয়ে রইলাম। বিশ্বাস কর ভাই, আমি ওকে খারাপ ভাবতে পারলাম না ; রবং কাকুর প্রতি আমার দারুণ মায়া হল। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই আমি অবাক। দেখি, আমিই কাকুকে জড়িয়ে শুয়ে আছি।

এইভাবে মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলতে খেলতেই একটা বছর পার হল।

কবিতা, আজকে তুমি একটু ড্রিঙ্ক করবে?

আমি হাসতে হাসতে বলি, কেন কাকু? আজ তো আপনার জন্মদিন না।

আজ শনিবার।

তাতে কি হল?

কাল আমারও অফিস নেই, তোমারও ইউনিভার্সিটি নেই।

তাতে কি হল?

সব ব্যাপারে কাকুকে নিঃসঙ্গ রাখছ কেন? একটু থেমে বললেন, না হয় আমার মতো অপদার্থের জন্য তুমি একটু খারাপই হলে।

না, না, ভালো খারাপের কোনো ব্যাপার নয়।

তাহালে 'প্লিজ' গিভ মি কোম্প্যানি।

গত এক বছরে কাকুর অনুরোধে আমাকে দু'তিন দিন হুইস্কি খেতে হয়েছে কিন্তু ঠিক উপভোগ করিনি। সেই শনিবার সন্ধ্যায় আমি প্রথম হুইস্কি খেয়ে সত্যি আনন্দ পেলাম।

এক পেগ শেষ হবার পর আমিই কাকুকে বললাম, কাকু আরেক রাউন্ড হোক।

কাকু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

বেশ লাগছে।

প্রথম পেগ শেষ করতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগলেও সেকেন্ড পেগ আধ ঘণ্টায় শেষ হতেই কাকু আবার গেলাস ভরে আনলেন। আমি আপত্তি করলাম না। ওই গেলাস নিয়েই আমি ডাইনিং

টেবিলে বসলাম। সামান্য কিছু খেলাম। তারপর গেলাসের বাকি হুইস্কিটুকু গলায় ঢেলে দিয়েই দু'হাত দিয়ে কাকুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমাকে শুইয়ে দিন।

শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

না, না, বরং বেশ ভালো লাগছে।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি, আমরা দুজনে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছি। আস্তে আস্তে আমি আবিষ্কার করলাম, আমরা দুজনে রোজই এক বিছানায় শুই। তবে ভাই, বিশ্বাস কর, কাকু কোনো দিনের জন্যও আমার কাছ থেকে এর বেশি দাবি করেননি।

তারপর আমি এম. এ. পাশ করলাম। ভালোই রেজাল্ট হল। রিসার্চ শুরু করলাম। সারাদিনে এত পরিশ্রম করতে হয় যে বাড়ি ফেরার পরই ঘুমিয়ে পড়ি। অধিকাংশ দিনই জানতে পারি না, কখন সালাউদ্দিন চলে যায় বা কাকু বাড়ি ফিরে আসেন।

সাড়ে সাতটা-আটটার সময় ঘুম ভাঙার পর স্নান করি। দু-এক ঘণ্টা লেখাপড়া করি। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে হয়তো দুজনে গল্পগুজব করি।

একদিন কাকু ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, রিসার্চ তো প্রায় শেষ হয়ে এলো, এরপর কি করবে?

আগে শেষ হোক। তারপর ভেবে দেখব।

কাকু বলেন, কি আর করবে? কোথাও ভালো চাকরি নিয়ে চলে যাবে।

চলে গেলেও আপনি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসবেন।

তোমার স্বামী হয়তো আমার যাতায়াত পছন্দ করবেন না।

আমি বিয়ে-টিয়ে করছি না।

বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

কেন?

কেন আবার? তোমার মতো সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে অনেকেই বিয়ে করতে চাইবে।

অন্যের ইচ্ছায় তো আমি বিয়ে করব না।

অন্যের আগ্রহে তোমারও বিয়ে করার ইচ্ছা হবে।

তার কোনো মানে নেই।

মানে আছে কবিতা। কাকু আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের ওপর দুটো হাত রেখে বললেন, তুমি তো কোনোদিন হুইস্কি খেতে না কিন্তু আমার আগ্রহে আজকাল মাঝে মাঝে ড্রিঙ্ক কর, তাই না?

আমি মাথা নাড়ি। এবার কাকু বলেন, আমি নিজে আগ্রহ করে তোমার কাছে কিছু দিন শোবার পরে...

বুঝেছি।

আমার যদি আরও এগিয়ে যাবার ইচ্ছা থাকত তাহলে হয়তো...

না কাকু, সে ইচ্ছা আপনার হবে না।

আমি কথার কথা বলছি, আমি আগ্রহ দেখালে তুমিও হয়তো বাধা দেবে না।

আমি কোনো কথা বলি না। মুখ নীচু করে বসে থাকি।

কিছুক্ষণ পরে কাকু আমার দুটি হাত ধরে বললেন, অনেক রাত হয়েছে। চল, শুতে যাই।

আমি নিঃশব্দে কাকুর সঙ্গে শুতে যাই।

কাকু ঘুমিয়ে পড়েন কিন্তু আমি জেগে থাকি। নানা কথা ভাবি, কাকুর কথা, আমার কথা। হয়তো বাবা-মা দাদুর কথাও ভাবি। ভাবি, আমার জীবনটা কি বিচিত্রভাবে ঘুরে গেল। ক'বছর আগে যাকে চিনতাম না, যে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল আজ আমি তারই পাশে শুয়ে আছি।

হঠাৎ পাশ ফিরে শুয়ে কাকুকে দেখি। একটু হাসি। ঘুমিয়ে পড়লে কাকুকে শিশুর মতো মনে হয়। ক্লান্ত, শ্রান্ত, অসহায়। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, ঘুমোলে কী সবাইকে এমন অসহায় মনে হয়?

আস্তে আস্তে ওর মুখে, মাথায় হাত দিই। হঠাৎ গলার কাছে হাত দিয়ে দেখি ভিজে গেছেন। নিজের আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিই। পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে দিই। কাকুর মুখের সামনে মুখ নিয়ে দেখি। ওর নিঃশ্বাস আমার মুখে এসে পড়ছে। বেশ লাগছে। ওকে যেন ভালো লাগে। নিজেই নিজেকে বলি, কাকু তো বাবার চাইতে সাত-আট বছরের ছোট। তার মানে উনি মোটামুটি আমার চাইতে দশ-বারো বছরের বড়। ব্যাস! আমি বোধহয় একটু ঘনিষ্ঠ হই। ঘুমের ঘোরেই কাকু আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেন। আমি আপত্তি করি না, ওকে দূরে সরিয়ে দিই না। পারি না। ওকে দূরে সরিয়ে দেবার মতো শক্তি আমি হারিয়ে ফেলি।

ভাই, তোমার কাছে স্বীকার করছি, সেদিন সেই অন্ধকার রাত্তিরে আমি কাকুকে ভালোবাসলাম আর সেই ভালোবাসার আগুনে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম।

বেশ কিছুকাল পরের কথা। আমার রিসার্চ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু রেজাল্ট বেরোয়নি। প্রায় সারা দিনই বাড়ি থাকি। তাছাড়া সালাউদ্দিন 'আজমীর শরীফ'এ তীর্থ করতে গেছে বলে আমিই রান্নাবান্না করি। দুপুরের দিকে কলিংবেলে বাজতেই দরজা খুলে দেখি, একজন তিরিশ-বত্রিশ বছরের সুন্দরী মহিলা।

আমি কিছু বলার আগেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন, সালাউদ্দিন আছে?

না, ও আজমীর গিয়েছে।

তার মানে ওর ফিরতে দেরি হবে।

আপনি কি সালাউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

উনি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই কি কবিতা?

হ্যাঁ। আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না।

আপনি আমাকে চিনবেন না। হেমন্তবাবুর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

এতক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। বললাম, আপনি ভিতরে আসুন। উনি ভিতরে এলেন, বসলেন। আমি ওর সামনের সোফায় বসে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নামটা জানতে পারি?

আমার নাম রমলা।

আপনি কি কাকুর অফিসে কাজ করেন?

আপনি বুঝি হেমন্তকে কাকু বলেন?

বিচিত্র হাসি হেসে উনি এই প্রশ্ন করতেই আমার সারা শরীর জ্বলে উঠল। খুব গম্ভীর হয়ে বললাম, হ্যাঁ উনি আমার কাকু।

উনি একবার খুব ভালো করে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, আপনার কাকু তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাই দ্য ওয়ে মাইশোর সিল্কের শাড়িটা আপনার পছন্দ হয়েছিল তো?

ওর কথা শুনে আমার গা জ্বলে গেল। বললাম, সবই তো বুঝলাম কিন্তু আপনার পরিচয়টা জানতে পারলাম না।

আপনার মতো হেমন্তও আমার বন্ধু।

তার মানে?

রোজ অফিস ফেরত আমার কাছে যায়। আগে মাঝে মাঝে রাত্তিরটা আমার কাছেই কাটাত কিন্তু আজকাল আপনার জন্য রাত্তিরে আর আমার কাছে থাকে না।

আপনি কি এই সব আজেবাজে কথা বলতে আমার কাছে এসেছেন?

উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না। এই দিকে একটু কাজ ছিল। তাই ভাবলাম, একবার আপনাকে দেখে যাই।

আপনার দেখা হয়েছে?

দরজার দিকে এগোতে এগোতে রমলা আরেকবার আমাকে ভালো করে দেখে বললেন, হ্যাঁ দেখলাম। বেশ লোভনীয় জিনিস।

উনি বেরিয়ে যেতেই আমি দরজা বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বসে রইলাম। কাকুর উপর রাগে দুঃখে ঘেন্নায় সারা শরীর জ্বলে গেল। তারপর মনে মনে ঠিক করলাম, না, আর এখানে নয়।

সুপর্ণাকে টেলিফোন করলাম, শোন তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরি দরকার।

কেন, কী হল?

তোর বরকে দিয়ে আমার একটা উপকার করিয়ে দিতে হবে।

কাজটা কি, তাই বল।

তুই বাড়িতে আছিস?

আর কোথায় যাব?

তাহলে আমি আসছি।

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি নিয়ে সুপর্ণার বাড়ি গেলাম। সোজাসুজি বললাম, কাকুর চরিত্র ভালো নয়। আমি আর একদিনও ওখানে থাকতে চাই না।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, এখন তো আমার শ্বশুর-শাশুড়ি নেই, তুই আমার এখানে চলে আয়।

দরকার হলে আসব কিন্তু তোর বরকে দিয়ে Y. W. C. A-তে আমার একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

সে ব্যবস্থা হয়তো ও করে দেবে কিন্তু তাতে দু-এক মাস সময় লাগবেই।

কিন্তু আমি আর একদিনও কাকুর ওখানে থাকতে চাই না।

তুই আজই এখানে চলে আয়। তারপর ওখানে ঘর পেলেই চলে যাস।

তোর বরের মত না জেনে আমি আসতে পারি না।

আমার বর তোকে ওর আপন বোনের চাইতেও বেশি ভালোবাসে।

তা তো জানি কিন্তু তবুও তার মতামত না জেনে আমার আসা উচিত নয়।

ঠিক আছে, আজ রাত্রে আমি ওর সঙ্গে কথা বলে রাখব।

তুই আমাকে টেলিফোন করিস, তবে কাকু অফিস যাবার আগে করিস না।

এগারোটা নাগাদ করব।

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

পরের দিন দুপুরের দিকে সুপর্ণা ওর বরের অফিসের গাড়ি নিয়ে আমার কাছে এলো।

আমি আমার সব জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হলাম। কাকুকে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে এলাম—আপনি আমার জন্য যা করেছেন, তা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। আপনার কাছে এই ক'বছর থেকে আমি যে অপরিসীম অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম, তা আমার ভবিষ্যত জীবনের পাথেয় হয়ে রইবে। আমি যাচ্ছি। আর কোনোদিন আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা নেই। আপনিও আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন না। সব শেষে জানাই, আপনার বান্ধবী রমলা এসেছিল।

অকস্মাৎ আমার জীবন আবার মোড় ঘুরল।

তোমার দুজনে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

সাত

সুপর্ণার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্বের একটা ইতিহাস আছে। আমরা দুজনে একসঙ্গে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হবার ক'দিন পরই হঠাৎ কি কারণে যেন স্ট্রাইক হল। ভাবছিলাম লাইব্রেরিতে বসে কাজ করব কিন্তু হঠাৎ সুপর্ণা এসে অনুরোধ করল, চলুন সিনেমায় যাই। বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও ওর অনুরোধে মত দিলাম। কিছুক্ষণ এর-ওর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে এসপ্ল্যানেড পাড়ায় গিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করেও কোনো হলে টিকিট পেলাম না। সুপর্ণার বাড়ি ফেরার মতলব ছিল না ; তাই ওকে আমার আস্তানায় নিয়ে গেলাম।

সারা দুপুর-বিকেল আমরা আড্ডা দিলাম। কত কি বললাম আর শুনলাম, তার ঠিক ঠিকানা নেই। ওই এক দুপুরবেলা আড্ডা দিতে দিতে আমরা কখন যে আপনি-তুমি পেরিয়ে তুই-এ পৌঁছেছি তা কেউই জানতে পারলাম না।

বাড়ি ফেরার আগে সুপর্ণা হাসতে হাসতে বলল, যাই বলিস কবিতা, প্রেমে পড়লে তোর এই আস্তানাটা দারুণ কাজে লাগবে।

আমিও হাসতে হাসতে জবাব দিলাম, স্বচ্ছন্দে কাজে লাগাস।

এরপর থেকে সুপর্ণা মাঝে মাঝেই ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমার ওখানে কাটিয়ে যেত। বলতো, কবিতা, একটা সত্যি কথা বলবি?

কেন বলব না?

তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে করে?

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করি, কেন? তোর বুঝি ইচ্ছে করছে?

সুপর্ণা খোলাখুলিই বলে, ঠিক বিয়ে করতে ইচ্ছে না করলেও ঠিক এ রকম একলা একলা থাকতেও ভালো লাগে না।

আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা আমার দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তুই কি কারুর প্রেমে পড়েছিস?

পড়িনি, তবে পড়লে ভালো হয়।

ইউনিভার্সিটিতে তো কত মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও বলল, একমাত্র শ্যামল ছাড়া আর কারুর পাশে বসতেও ইচ্ছে করে না।

শ্যামল সত্যি ভালো ছেলে। যেমন স্মার্ট তেমন...

আবার আমাকে বাধা দিয়ে বলল, সব চাইতে বড় কথা ভারি সুন্দর কথা বলতে পারে।

ওর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বললেও খারাপ লাগে না।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, ওর আর কি গুণ আছে?

ওর সবচাইতে বড় গুণ ও তোকে ভালোবাসে।

কেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছিস? শ্যামল যে তোকে ভালোবাসে আর ওকে যে তোরও ভালো লাগে এ কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিস কেন?

ভাই রিপোর্টার, এ কথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটা সময় আসে, যখন সে আর নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না। নিঃসঙ্গ থাকতে চায় না। সে তখন প্রাণের মানুষকে কাছে চায়। এই শত-সহস্র লক্ষ বছরের পুরনো পৃথিবীকেই নতুন করে আবিষ্কার করতে চায়।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত ছেলেদের চাইতে মেয়েরাই অনেক আগে নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। করবেই। তবে কারুর দু'দিন আগে কারুর দু'দিন পরে।

আমার বেশ মনে পড়ে, আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখনই কয়েকজনকে দেখেছি যারা দেহে ও মনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দু'তিনজন তো তখনই সংসার করার জন্য বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এ সব খুব অস্বাভাবিকও নয়। এক বিশেষ সময়েই প্রকৃতির জীবনে বসন্ত আসে কিন্তু মানুষ তো কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলার দাস নয়। তার জীবনে কখন বসন্ত আসবে, তা কেউ জানে না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Age does not depend upon years, but upon temperament and health' সত্যি, বছরের হিসাব করলেই বয়স জানা যায় না ; মন ও স্বাস্থ্যের ওপরই বয়স নির্ভর করে।

ছেলেবেলায় শুনতাম বাঙালি মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয় কিন্তু এই নিউ ইয়র্কেই এক বাঙালি মহিলা আছেন যাকে দেখে মনে হয় তিনি কোনোদিনই বুড়ি হবেন না। বেশ ক'বছর আগে কলকাতার একজন বিখ্যাত গায়ক এ দেশে এসেছিলেন। এক অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনতে গিয়েই মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই দেখা হয়। ওকে নিয়ে নানা জনে নানা কথা বলতেন। কেউ বলতেন, ওর স্বামী মারা গিয়েছেন, কেউবা বলতেন, উনি ডির্ভোস করেছেন। আবার এমন কথা বলতেও শুনেছি যে ওর একাধিক বিয়ে। এ সব কথা শুনে আমি হেসেছি। কারণ আমরা যতই প্রগতিবাদী হই না কেন, যতই বিলেত আমেরিকায় থাকি না কেন, একজন মেয়েকে একা থাকতে দেখলেই আমরা সমালোচনা না করে থাকতে পারি না।

সে যাই হোক মিসেস চ্যাটার্জির বয়স নিয়ে আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেও কোনো কিছু জানতে পারেনি। কেউ বলেন চল্লিশ, কেউ বলেন পঞ্চাশ। অনেকে আবার বলেন, কিছু না হলেও ওর বয়স ষাট হয়েছে। বয়স যাই হোক মিসেস চ্যাটার্জিকে দেখে এখনও অনেক পুরুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য হয়। আস্তে আস্তে ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হবার পর উনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, দ্যাখ কবিতা, যে মেয়েদের একলা একলা জীবন কাটাতে হবে, তাদের যৌবন আর অর্থ সব সময় মজুত রাখতে হবে।

আমি ওর কথা শুনে হাসি।

না, না, কবিতা, হাসির কথা নয়। যৌবন আর অর্থ না থাকলে আমাদের মতো মেয়েদের বেঁচে থাকাই মুশকিল।

মিসেস চ্যাটার্জি শ্যাম্পেনের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে আবার বললেন, পৃথিবীর সব দেশের

সব পুরুষরাই মেয়েদের যৌবনের মর্যাদা দেয়। আর অর্থ?

উনি একটু হাসলেন। অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজনের কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

আমার শ্যাম্পেনের গেলাস তখনও ভর্তি। ওর গেলাস খালি হয়ে গেছে। আমি আবার ওর গেলাস ভরে দিলাম।

মিসেস চ্যাটার্জি হাসতে হাসতে বললেন, হাজার হোক আমরা রামচন্দ্রের অকাল বোধনকেই যেমন সবচাইতে বড় উৎসব বলে মেনে নিয়েছি, সেই রকম জীবন যৌবনের ব্যাপারেও আমরা অকাল বোধন করতে অভ্যস্ত।

তার মানে?

আঠারো কুড়ি বাইশের পর আমাদের দেশের মেয়েরা আর যৌবন ধরে রাখতে পারে না। স্বামীর কাছে সে যৌবন উৎসর্গ করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

এবার আমি হাসতে হাসতে বলি, ঠিক বলেছেন।

অনেক দিন মিসেস চ্যাটার্জি সঙ্গে দেখা হয় না কিন্তু আজ তোমাকে সুপর্ণার কথা লিখতে বসে ওর কথাগুলো মনে পড়ছে। সত্যি, সুপর্ণা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। ও মাঝে মাঝে আমাকে যা বলত তা শুনে মনে হত, ও আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারছে না। একদিন আমি হাসতে হাসতে বললাম, তোর মতো বিয়ে পাগল মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।

সুপর্ণা একটু ম্লান হেসে বলল, আমার দাদা-বৌদির বেলেল্লাপনা দেখলে তুই আমার চাইতেও বেশি বিয়ে পাগল হয়ে উঠতিস।

তার মানে?

তার মানে আমি তোকে মুখে বলতে পারব না।

ওই কথা বলার পর আমি আর ওকে প্রশ্ন করিনি। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার সময় আমরা কেউই ভালো বা খারাপ কিছুই থাকি না। নিজেরা সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা ও সর্বোপরি পরিবেশ আমাদের ভালো বা মন্দ করে। তোমরা ছেলেরা হয়তো জানতেও পারো না আশেপাশের মানুষের জন্য মেয়েদের জীবনে কি নিদারুণ সমস্যা বা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

যাই হোক, এম. এ. পরীক্ষা দেবার পরই সুপর্ণার বিয়ে হল। আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওর বিয়েতে যেতে পারিনি। বিয়ের পর ওরাও কলকাতার বাইরে চলে গেল। বোধহয় মাসখানেক পরের কথা। হঠাৎ একদিন সুপর্ণা আর অমিয় আমার ওখানে এসে হাজির।

সুপর্ণা হাসতে হাসতে অমিয়কে বলল, যে কবিতার কথা এতদিন শুধু শুনেছ, সে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

অমিয় বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাতেই আমি প্রশ্ন করলাম, কি এত ভাবছেন?

অমিয় একটু হেসে বলল, ভাবছি দু-এক মাস আগে আপনার সঙ্গে আলাপ হলে কি কেলেঙ্কারি হত!

সুপর্ণা প্রশ্ন করল, কি আবার কেলেঙ্কারি হত?

আমার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে অমিয় নির্বিকার চিত্তে বলল, ওঁর সঙ্গে আগে আলাপ হলে আমি হয় বিয়ে, না হয় আত্মহত্যা করতাম।

আমি লজ্জায় মুখ নীচু করে হাসি। সুপর্ণা হাসতে হাসতে আমাকে বলল, এই লোককে নিয়ে আমি কি করে ঘর করব, বল তো?

এবার আমি বলি, তোর ভয় নেই। আমি তোর ঘর ভাঙব না।

অমিয় বলল, আপনাকে ভাঙতে হবে না ; আমিই হয়তো আমাদের ঘর ভেঙে আপনার কাছে আসব।

আমি বললাম, আসলেও ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

কয়েক মাস পরের কথা। ভাইফোঁটার দিন সকালবেলায় সুপর্ণাকে নিয়ে অমিয় এসে হাজির। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, হঠাৎ এতদিন পর এই সাত সকালে...

অমিয় বলল, চটপট আমার কপালে একটা ফোঁটা দাও, নয়তো তোমার কাছে আসতে পারছি না।

কেন? সুপর্ণা আসতে দিচ্ছে না?

সুপর্ণা বলল, আমি কেন আসতে দেব না? ও নিজেই ভাইফোঁটা না নিয়ে তোর কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

কেন?

সুপর্ণা অমিয়র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বলব, কেন তুমি ওর কাছে আসতে ভয় পেতে?

অমিয় হাসতে হাসতে বলল, নির্বিবাদে।

ও বলে, বাবা, ভাই, সন্তান ছাড়া আর সব পুরুষ তোকে দেখে কামনার আগুনে জ্বলবেই।

এবার আমি লজ্জার হাসি হেসে বললাম, সুপর্ণা, তোর স্বামী এবার আমার কাছে মার খাবে।

যাই হোক সেদিন অমিয়কে ভাইফোঁটা দিলাম। তুমি শুনলে অবাক হবে এর আগে আমি আর কাউকে ভাইফোঁটা দিইনি।

ভাই বোনের সম্পর্ক যে কত মধুর, তা শুধু গল্প উপন্যাসে পড়েছিলাম ; কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না! অমিয় আমার সে অসম্পূর্ণতার দৈন্য সত্যি দূর করেছিল। কামনা লালসার আগুনে জর্জরিত না হয়ে যে কোনো পুরুষ সত্যি আমাকে ভালোবাসতে পারে, তার প্রথম অভিজ্ঞতা অমিয়।

সন্ধের পর অফিস থেকে ফিরেই অমিয় আমাকে বলল, তোমার ওপর আমি বেশ রাগ করেছি।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

আমার অনুমতি না নিয়ে বুঝি তুমি এখানে আসতে পারো না?

আমি একটু হেসে বললাম, নিশ্চয় পারি।

তাহলে কালই চলে এলে না কেন?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে ওর হাতের ব্রীফকেসটা টেবিলের ওপর রেখে দিলাম।

অমিয় টাই-এর নট্ ঢিলা করতে করতে একটু মুচকি হেসে বলল, তারপর শুনছি, তুমি হস্টেলে চলে যাবে।

আমাকে দেখেই কি তোমার ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে? এবার আমি সুপর্ণার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোর স্বামী কি রকম ঝগড়া করছে, দেখছিস?

সুপর্ণা বলল, তোমাদের ভাই বোনের ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না।

অমিয় কোট খুলে বলল, কবিতা, একটা কথা শুনে রাখ। যতদিন কলকাতায় থাকবে, ততদিন এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে না।

আচ্ছা যাব না। এবার তোমার শান্তি তো!

যেতে চাইলেও যেতে দিচ্ছে কে?

ভাই রিপোর্টার, অমিয় আমার জন্য কি করেছে তা বললে, অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু তবু তোমাকে বলব।

তোমার আগামী জীবনের সঙ্গিনীকে বল, অনেক দিন তার চিঠি পাইনি। তুমিও চিঠি দিও। প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

আট

এই পৃথিবীতে যেমন আলো আঁধারের খেলা চলে, আমার জীবনেও ঠিক তেমনি ভালোমন্দের খেলা চলছে। কাকুর আশ্রয় ছেড়ে আসার সময় মনে হয়েছিল, এ অন্ধকার আমার জীবন থেকে কোনো দিন কাটবে না, কিন্তু এমনই আশ্চর্য ব্যাপার যে তার পরই আনন্দে খুশিতে আমার জীবন আবার ঝলমল করে উঠল।

পাঁচ সাত দিন কেটে যাবার পর একদিন ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে অমিয় বলল, যত দিন তুমি এ দেশে থাকবে ততদিন তুমি এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে? এ দেশে ছাড়া আর কোন দেশে থাকব?

না তুমি এ দেশে থাকবে না।

বাজে বকো না। আমি আবার কোথায় যাব আমি হেসে বললাম, তোমাদের দুজনের ঘাড় ভেঙে যখন এমন মৌজ করে দিন কাটাচ্ছি তখন আর...

অমিয় অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, সে কী? তুমি খরচাপত্র দিচ্ছ না?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি খরচ না দিলে কি তোমার একার দ্বারা এ সংসার এভাবে চলত?

যাই হোক অমিয় বলল, পাসপোর্টের অ্যাপলিকেশন এলেই তুমি পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবে।

কেন? পাসপোর্ট দিয়ে আমি কি করব?

এ দেশে থাকলে তোমার মতো মেয়ের কপালে অনেক দুঃখ আছে। তোমাকে এখানে থাকতে হবে না!

কিন্তু বিদেশ গিয়ে আমি কি করব?

হোয়েন ইউ উইল কাম টু দ্য ব্রিজ, ইউ ইউল ক্রস দ্য ব্রিজ। এখন সেসব কথা ভাবতে হবে না।

সেদিন আর কোনো কথা হল না। ও অফিস চলে গেল।

দু'একদিন পর অফিস থেকে ফিরেই অমিয় আমাকে পাসপোর্টের ফর্ম দিয়ে বলল, এটা ফিল আপ করে রেখ। তারপর সুপর্ণার সঙ্গে গিয়ে প্যারাডাইস স্টুডিও থেকে ছবি...

কিন্তু...

সুপর্ণা বলল, অত কিন্তু কিন্তু করছিস কেন? তোর মতো মেয়ে বিদেশে গেলে কত সুযোগ পাবি...

হঠাৎ তোরা দুজনে আমাকে তাড়াবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস কেন?

অমিয় গম্ভীর হয়ে বলল, যদি অবিলম্বে বিয়ে করে নার্সিংহোমে ভর্তি হতে রাজি থাকিস, তাহলে অবশ্য বিদেশে না গেলেও চলবে।

আজে-বাজে কথা বললে, একটা থাপ্পড় খাবে।

মোটেও আজেবাজে কথা বলছি না ; ঠিক কথাই বলছি। তোমার মতো মেয়ের পক্ষে এদেশে একলা থাকা অসম্ভব।

কেন?

চারদিক থেকে এত শুভাকাঙ্ক্ষীর সমাগম হবে যে আত্মরক্ষার জন্য কোনো পথ পাবে না।

তারপর একদিন আমি সত্যি সত্যিই পাসপোর্ট পেলাম।

অমিয় জিজ্ঞাসা করল, জাহাজে যাবে, নাকি প্লেনে যাবে?

কোথায়?

আপাতত লন্ডনে।

তারপর?

তারপর যেখানে তোমার অদৃষ্ট টেনে নেবে, সেখানেই যাবে।

লন্ডনে গিয়ে কি করব?

বাপ-ঠাকুর্দার দেওয়া টাকা যখন আছে, তখন আরো দু এক বছর লেখাপড়া করে জীবন সংগ্রাম শুরু করে দাও।

আমি মুখ নীচু করে একটু গম্ভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি সত্যি তুমি আমাকে যেতে বলছ?

হ্যাঁ কবিতা। এই সতী-সাবিত্রীর দেশে তোমার মতো নিঃসঙ্গ যুবতীর শান্তিতে থাকা সত্যি অসম্ভব। তুমি বাইরেই চলে যাও।

বিদেশে কি সবাই সাধু?

না, তা নয় ; তবে সেখানে ছুঁচোর মতো রাতের অন্ধকারে কেউ তোমাকে বিব্রত করবে না। যারা তোমাকে চাইবে, তারা সোজাসুজি তোমাকে সে কথা বলতে দ্বিধা করবে না।

আমি মুখ নীচু করেই চুপ করে বসে থাকি। কোনো কথা বলি না। ভাবি। নানা কথা। আকাশ-পাতাল। অতীত-ভবিষ্যৎ।

অমিয় আবার বলে, ও দেশে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বলতে পারেন আমি বেজন্মা, বাস্টার্ড! আর এ দেশে? ছত্রিশ কোটি দেবতার দেশে আমরা মহাবদমাইস হয়েও ভদ্দরলোকের খোলস পরে বেশ দিন কাটাচ্ছি।

আমি আর সুপর্ণা দুজনেই হাসি।

অমিয় রেগে ওঠে, না, না, হাসির কথা নয়। আমরা কত বিধবা আর কত ঝিয়ের সর্বনাশ করেও ভদ্দরলোকের ভূমিকায় অভিনয় করে সবাইকে বোকা বানিয়ে দিচ্ছি।

সুপর্ণা প্রশ্ন করে, তাই বলে বিলেতে কি কেউ কোনো মেয়ের সর্বনাশ করে না?

হাইকোর্টের পাকা ব্যারিস্টারের মতো অমিয় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, করে, কিন্তু তারা নবজাত শিশুকে ডাস্টবিনে ফেলে আসে না।

রাত্তিরে খেতে খেতে অমিয় বলল, আমার এক অধ্যাপক ডক্টর সরকার এখন লণ্ডনে আছেন। আমি তাঁকে লিখে দেব। তিনি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তারপর তুমিই তোমার ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

যদি না পারি?

ফিরে এসো। এ বাড়ির দরজা তো তোমার কাছে সব সময়ই খোলা থাকবে।

সুপর্ণা বলল, একবার গেলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবি না। তারপর একটু হেসে বলল, তুই

ওখানে থাকলে একবার হয়তো আমরাও ঘুরে আসব।

অমিয় বলল, হয়তো মানে? ডেফিনিট্‌লি যাব।

ভাই রিপোর্টার, যখনকার কথা বলছি, তখন পাসপোর্ট পাওয়া কঠিন ছিল কিন্তু বিদেশ যাওয়া সহজ ছিল। জাহাজ প্লেনের ভাড়াও অনেক কম ছিল। তবু কলকাতা ছেড়ে বিদেশ যাবার কথা মনে হতেই খারাপ লাগল। এই এত বড় পৃথিবীতে আমার কোনো আপনজন না থাকলেও নিজের দেশ, সমাজ সংসার ছেড়ে বিদেশ যেতে মনে মনে বিশেষ উৎসাহবোধ করলাম না। আবার মনে হল, না, না, চলেই যাই। কি হবে এদেশে থেকে? কে আছে আমার? এখানে একলা থাকলেই অসংখ্য পরিচিত অপরিচিত মানুষের সমালোচনার শিকার হতে হবে। শৈশবে মা-বাবা, কৈশোরে ভাইবোন, যৌবনে স্বামী ও বার্দ্ধক্যে সন্তান ছাড়া এ দেশে কোনো মেয়ের পক্ষে একা থাকা স্বাভাবিকও নয়, সম্ভবও নয়! এই যে অমিয় আর আমি! নিছকই ভাইবোন কিন্তু পারব কি আমরা দুজনে একসঙ্গে হাসতে, খেলতে, গল্প করতে? না। প্রত্যেকটি দর্শক এক একটি আরব্য উপন্যাস সৃষ্টি করবে। যে দেশে ভাইবোন একসঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে যেতে পারে না, সে দেশে না থাকাই ভালো।

আবার মনে মনে ভাবি, যে সমালোচনা করবে করুক, তবু তো এটা আমার দেশ। এখানে আমার ইচ্ছামতো হাসতে ও কাঁদতে পারি কিন্তু বিদেশে? সেখানে কে আমার আনন্দে হাসবে? দুঃখের দিনে কে আমার জন্য চোখের জল ফেলবে? তাছাড়া একবার বিদেশ গেলে তো চট করে আর আসতে পারব না।

অমিয়, ভাই একটা কথা বলব।

বল।

তুমি এখানেই আমার একটা চাকরি জোগাড় করে দাও। আমি একলা একলা বেশ থাকতে পারব।

ও হাসতে হাসতে বলল, তুমি কি ভাইফোঁটা দিয়ে সব পুরুষ মানুষের চিত্ত চাঞ্চল্য দূর করতে পারবে?

আমি কি হেলেন অফ ট্রয়?

ঈষৎ তির্যক দৃষ্টিতে অমিয় একবার আমাকে দেখে নিয়ে সুপর্ণাকে বলল, তোমার বান্ধবীকে বলে দাও, এই পৃথিবীর সব পুরুষ আমার মতো সন্ন্যাসী নয়।

সুপর্ণা হাসতে হাসতে বলল, তুমি সন্ন্যাসী!

অব কোর্স!

তোমার মতো কামুক এ পৃথিবীতে আর কেউ আছে?

ক'জন পুরুষ সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা আছে সুন্দরী?

একজনকে দেখে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আর দেখার দরকার নেই।

অমিয় গম্ভীর হয়ে বলল, শাস্ত্র বলেছে, ধর্ম রক্ষার জন্য বংশরক্ষা করা পুরুষের অবশ্য কর্তব্য।

এতক্ষণ আমি মুখ টিপে হাসছিলাম। এবার বললাম, তাই বুঝি এক দিনের জন্যও বৌকে ছেড়ে থাকতে পারো না?

মিস চৌধুরী, ইউ আর মিসটেকন্। আমার স্নেহালিঙ্গন ছাড়া আমার স্ত্রীর ঘুম আসে না।

সুপর্ণা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, হা ভগবান! কি মিথ্যেবাদী! আমাকে রাগালে আমি হাটে

হাঁড়ি ভেঙে দেব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সুপর্ণার হাত ধরে বললাম, প্লিজ, এখনি ভাঙতে শুরু কর!

আস্তে আস্তে দিনগুলো এগিয়ে চলে আর অমিয়ও আমার বিদেশ যাত্রার ব্যাপারে উদ্যোগ আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে আনে। হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে এসেই আমাকে একটা চিঠি দিয়ে বলল, হিয়ার ইজ এ লেটার ফ্রম ডক্টর সরকার। পড়ে দেখ। বেশ এনকারেজিং চিঠি।

চিঠিখানা পড়ে দেখি ডক্টর সরকার লিখেছেন, তোমার বোন ডক্টরেট হলে এখানে নিশ্চয়ই ভালো সুযোগ পাবে এবং আমি আমার যথাসাধ্য সাহায্য করব। মনে হয় তোমার বোনের কোনো অসুবিধা হবে না।

ডক্টর সরকারের এই চিঠিখানা পড়ার পর বিদেশ যাওয়া সম্পর্কে আমিও উৎসাহ বোধ করলাম। অমিয় আর সপুর্ণাকে বললাম, সামনের মাসের সাত তারিখে আমার ভাইবা। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই রেজাল্ট জানতে পারব। যদি সত্যি সত্যি ডক্টরেটটা পেয়ে যাই তাহলে ভাবছি চলেই যাব।

অমিয় বলল, ভাবছি মানে? তোমাকে বিদায় না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

আমি সুপর্ণাকে বললাম, দ্যাখ, তোর স্বামীর নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। তা নয়তো ও আমাকে তাড়াবার জন্য এমন পাগল হয়ে উঠেছে কেন?

সুপর্ণা বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

অমিয় বলল, খুব স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগর মশাইকে পর্যন্ত কত অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে। সুতরাং আমার মতো মহাপুরুষকেও যে তোমরা বদনাম দেবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

সুপর্ণা ঠোঁট উল্টে বলল, তুমি মহাপুরুষ!

এ গ্রেট ইজ নোন বাই দ্য নাম্বার অফ হিজ এনিমিজ–

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠি।

ভাই রিপোর্টার, আশু মুখুজ্যে মারা যাবার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বারোটা বেজেছে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমিও ডক্টরেট পেলাম। আমার রেজাল্ট বেরুবার পর অমিয় প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আমাকে বিলেত পাঠাবার ব্যাপারে যে কি পরিশ্রম করেছিল, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

আমার বিদেশ যাত্রার ব্যাপারে এত কিছু লেখার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু তবু আমি না লিখে পারলাম না। এই পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ বিশেষ কাজের জন্য আসে সে কাজ শেষ হইলেই তারা চলে যায়। আমার জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করার জন্যই বোধহয় ও এসেছিল। তা না হলে আমি চলে আসার এক বছরের মধ্যে অমিয় ক্যান্সারে কেন মারা গেল? আমার স্থির বিশ্বাস, ও থাকলে আমার জীবনটা এমন হতাশায় ভরে যেত না।

অমিয়কে হারাবার পর আমি নতুন করে উপলব্ধি করলাম, এ পৃথিবীতে শুধু দুঃখ ভোগের জন্যই আমি এসেছি। আমার মুখের হাসি ভগবান কিছুতেই সহ্য করবেন না।

নয়

হঠাৎ একটা পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল। তখন সবে স্কুলে ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি। একটু আধটু স্বাধীনতা আর নতুন বন্ধুদের নিয়ে বেশ আনন্দে দিন কাটছে। কারণে অকারণে হাসি, অহেতুক ঘুরে বেড়াই, অপরিচিতকেও পরিচিত মনে হয়। একদিন তিন-চারজন বন্ধু প্রায় জোর করেই শিখা সরকারের বাড়ি নিয়ে গেল। ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম, শিখার কাকুর কাছে ওরা হাত দেখাতে এসেছে।

এসব ব্যাপারে কোনো কালেই আমার আগ্রহ ছিল না কিন্তু সবার শেষে কাকুর কাছে হাত এগিয়ে দিলাম।

আমার বেশ মনে আছে, আমার হাতের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই উনি আপন মনে বললেন, ভারি অদ্ভুত হাত!

আমরা কেউ কিছু প্রশ্ন করার আগেই শিখা জিজ্ঞাসা করল, অদ্ভুত হাত মানে?

কাকু গম্ভীর হয়ে বললেন, এ রকম অদ্ভুত হাত খুব কম মেয়ের হয়।

শিখা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, যা বলতে যাও, সোজাসুজি বল।

কাকু মুখ নীচু করে আমার হাত দেখতে দেখতে বললেন, তোদের সামনে বলব না। তবে তোরা জেনে রাখ, এ সবদিক থেকেই তোদের হারিয়ে দেবে।

একটা অদ্ভুত অস্বস্তি নিয়েই ফিরে এলাম এবং প্রয়োজন হলেও শিখার বাড়ি যেতাম না। বছর দুই পরে কি একটা জরুরি কারণে ওর বাড়ি গিয়ে দেখি কাকু ছাড়া আর কেউ নেই। বাধ্য হয়ে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করেছিলাম।

সেদিন কাকু আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ?

ভালো। আপনি?

আমি খুব ভালো আছি। তোমাকে এতদিন দেখিনি কেন?

ঠিক আসা হয়ে ওঠেনি।

কাকু এবার আর কোনো ভূমিকা না করে বললেন, দেখি তোমার হাতটা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত এগিয়ে দিলাম। একটা নয়, আমার দুটো হাতই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখার পর কাকু বললেন, তোমাকে দু-চারটে কথা বলছি বলে কিছু মনে করো না।

কাকুর কথায় বেশ আন্তরিকতার স্বাদ পেয়ে বললাম, না, না, কি মনে করব।

সবচাইতে বড় কথা, তুমি কাউকে হাত দেখাবে না।

কেন?

তোমার জীবনের সব কথাই তোমার হাতে লেখা আছে। এসব কথা অন্য কারুর না জানাই ভালো।

আমি চুপ করে আছি। কাকু আপন মনে আমার হাত দেখছেন। কত কি ভাবছেন। বোধহয় মনে মনে নানারকম হিসাব নিকাশ করছেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করবে।...

উনি কথাটা বলতে না বলতেই আমি হাসি।

না, না, কবিতা, হাসির কথা নয়। তোমার অধিকাংশ বন্ধুদের চাইতে তুমি অনেক বেশি লেখাপড়া করবে। চাকরি-বাকরিতে এমন উন্নতি করবে যে...

আমি চাকরি করব?

নিশ্চয়ই করবে এবং তোমার কর্মজীবন বিদেশেই কাটবে।

আমি অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলি, বিদেশে!

উনি যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিলেন, তুমি বহু দূর দেশে জীবন কাটাবে এবং আজ এ কথাও বলে দিচ্ছি যে, হঠাৎ এমন একজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে, যার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টাতেই তুমি বিদেশ যাবে।

আমি একটু হেসে বললাম, এখন তো এসব কথা আমার কল্পনার বাইরে।

তোমার জীবনে বারবার এমন ঘটনা ঘটবে বা তুমি স্বপ্নেও ভাববে না।

যেমন?

কিছু মনে করবে না?

না।

যেসব কথা বলব, তা নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারব।

শিখা বা অন্য কোনো বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনকেও বলতে পারবে না।

না, কাউকে বলব না।

বারবার তোমাকে বহু পুরুষের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে হবে।

তার মানে?

এর চাইতে বেশি পরিষ্কার করে বলার সময় এখনও আসেনি।

আমি চুপ করে ভাবি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কাকু বললেন, তবে তুমি হেরে যাবার মেয়ে নও। যাই হোক না কেন, তুমি এগিয়ে যাবেই।

মেয়েদের পক্ষে কি বেশি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব?

অধিকাংশ মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তুমি অনেক দূর এগোবে।

কাকু, একটা প্রশ্ন করব?

নিশ্চয়ই করবে।

আমাকে কি বিয়ে করতে হবে?

কেন, তুমি কি বিয়ে করতে চাও না?

না।

মনে হয় না তুমি বিয়ে করবে। আর বিয়ে করলেও অনেক পরে করবে।

এই কাকুর কথা আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। অমিয় যখন আমার বিদেশ যাত্রার সবকিছু ঠিক করল, তখন হঠাৎ কাকুর কথা মনে পড়ল। কাকুর কথাগুলো মনে মনে রোমন্থন করে দেখলাম, ওর প্রতিটি কথাই আমার জীবনে বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে।

কলেজ ছাড়ার পর শিখার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। ওদের বাড়ির ঠিকানাটাও ভুলে গিয়েছিলাম। তিন-চারদিন নানা জায়গায় ঘোরাঘুরির পর শিখাদের বাড়ির ঠিকানা পেলাম তারপর সেখানে গিয়ে দেখি কাকু নেই। ওখান থেকে বারাসতের ঠিকানা নিয়ে আমি কাকুর কাছে হাজির হলাম।

প্রথমে উনি আমাকে চিনতে পারেননি। পরিচয় দিতে উনি তো অবাক! কাকু ও কাকিমা

খুব আদর যত্ন করে খাওয়ালেন। তারপর কাকুকে একলা পেয়ে বললাম, আপনার অনেক কথাই মিলে গেছে।

কাকু বললেন, তখন তো তুমি ছোট ছিলে ; তাই সব কথা বলতেও পারিনি।

আমি কোনো কথা না বলে হাত এগিয়ে দিলাম।

দু-তিন মিনিট ধরে আমার দুটো হাত খুব ভালোভাবে দেখে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, নিশ্চয়ই অনেক পড়াশুনা করেছ?

এম. এ. পাশ করার পর রিসার্চ করেছি।

ডক্টরেট হয়েছ?

হ্যাঁ।

এবার তো তোমার বিদেশ যাওয়া উচিত।

সামনের সপ্তাহের শেষের দিকে লন্ডন যাচ্ছি।

কাকু আপন মনে হেসে বললেন, যেতেই হবে। কিন্তু...

কিন্তু কি?

খুব বেশি দিন ওখানে থাকবে না।

দেশে ফিরে আসব?

না, না। অন্য কোথাও চলে যাবে!

এবার আমি নিজের থেকেই বললাম, আপনি বলেছিলেন হঠাৎ এক শুভাকাঙ্ক্ষীর চেষ্টাতেই আমি বিদেশ যাব। ঠিক তা-ই হল।

কাকু আমার কথার জবাব না দিয়ে বললেন, ইতিমধ্যে তোমার জীবনে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয়।

হ্যাঁ কাকু, ঘটেছে।

এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটবে।

আমি চমকে উঠে বললাম, আরো ঘটবে?

তখন তুমি ছোট ছিলে বলে এসব কথা বলিনি কিন্তু এখন তুমি বড় হয়েছ, অনেক লেখাপড়া করেছ বলে সাবধান করে দিচ্ছি।

কাকুর কথাটা শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। উনি তা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তবে তুমি জীবনে খুব নিকৃষ্ট লোকের সান্নিধ্যে আসবে না কিন্তু, এরা প্রত্যেকেই তোমার কিছু না কিছু উপকার করবেন।

এবার আমি বেশ গম্ভীর হয়েই বললাম, নিজেকে বিলিয়ে দিলে তো অনেক পুরুষই উপকার করবে।

না, না, তুমি নিজেকে বিলিয়ে দেবে না, কিন্তু ঘটনাচক্রে এ সব ঘটবেই। তুমি শত চেষ্টা করেও এদের হাত থেকে রেহাই পাবে না।

যদি বিয়ে করি?

কাকু অনেকক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে বললেন, চট করে তুমি বিয়ে করবে না।

এবার আমি প্রশ্ন করি, আমার বিদেশ যাওয়া কি উচিত হবে?

তোমাকে যেতেই হবে। শুধু বিদেশে যাওয়া নয়, প্রায় সারা কর্ম-জীবনই বিদেশে থাকবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, কাকু, আমাকে কি সারা জীবনই এই সব গ্লানির বোঝা বইতে হবে?

কাকু একটু হেসে বললেন, বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ প্রতিপত্তি বিদেশ ভ্রমণ যেমন উপভোগ করবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দু'চারটে ঘটনাও ঘটবে। তার জন্য দুঃখ করছ কেন?

একটু চুপ করে থেকে উনি আবার বললেন, কোনো মানুষের জীবনই সরলরেখা নয়।

স্বয়ং ডক্টর সরকারই আমাকে লণ্ডন এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা করলেন। কাস্টমস্ এনক্লোজারের বাইরে এসে ওঁকে প্রণাম করতেই উনি বললেন, গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ইয়েস ফাদার, ইউ উইল হ্যাভ টু লুক আফটার মী অ্যাজ ইওর চাইল্ড।

আই উইল।

আমি যখন লণ্ডন এলাম তখন ওখানে শরৎকালীন ছুটি চলছে। এয়ারপোর্ট থেকে বার্কিংহাম প্যালেস রোডের এয়ারওয়েজ টার্মিনালে যাবার পথেই ডক্টর সরকার বললেন, দিন সাতেক আমার ছুটি আছে। এই ক'দিন আমরা কোনো কাজের কথা বলব না। এই বুড়ো তোমাকে নিয়ে সারাদিন ঘুরবে।

কোথায় ঘুরবেন?

ঘুরে ঘুরে শহর দেখব।

কিন্তু আপনার তো সব কিছু দেখা। আপনি আবার কেন ঘুরবেন?

এটা কলকাতা বা দিল্লি বোম্বে নয় ; এখানে সারা জীবন কাটিয়েও সব কিছু দেখা হয় না।

আমি মোটর কোচ-এর ভিতরে বসে জানালা দিয়ে দু'চোখ ভরে লণ্ডন দেখছি। দু'-চার মিনিট পরে ডক্টর সরকার আমাকে বললেন বেঞ্জামিন ডিসরেলী এই মহানগরী সম্পর্কে কি বলেছিলেন জানো?

না।

একবার বলেছিলেন, London—a nation not, a city।

আমি হাসি।

হাসির কথা নয় মা ; উনি বোধহয় আরো এক ধাপ বাড়িয়ে বলতে পারতেন, এ শহরটা একটা ক্ষুদে পৃথিবী। তবে ডিসরেলী ঠিকই বলেছিলেন, London is roost for every bird!

আমি ওর কথা শুনে হাসি আর কোচের জানালা দিয়ে দেখি।

ডক্টর সরকার একটু হেসে বললেন, এ শহর যত দেখবে, ততই মনে হবে কিছুই দেখা হল না। আজকে বিশ্রাম নাও। কাল থেকে আমরা ঘুরব।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, কিন্তু আপনার মতো বুড়ো মানুষকে কষ্ট দেওয়া কি উচিত হবে?

উনি হাসতে হাসতে বললেন, নো ওয়ান ইজ টু ওল্ড ইন লন্ডন। তাছাড়া এটা তো কলকাতা নয়, সন্ধেবেলায় ফিরে এসে খানিকটা ওযাইন খেলেই আবার যৌবন ফিরে আসবে।

আমি হাসি।

হাসির কথা নয় মা! এই মহানগরীতে শরীর ও মনকে সতেজ রাখার সব ব্যবস্থা আছে।

আমি হাসি মুখে বলি, সে সুযোগ বোধহয় সব বড় শহরেই আছে।

না, মা, তা ঠিক নয়। নিউইয়র্ক অনেক বড় শহর কিন্তু সারা শহরটাই যেন স্টক এক্সচেঞ্জ

আর ডালহৌসি-চৌরঙ্গি!

আপনি আমেরিকাতেও গিয়েছেন?

উনি হাসতে হাসতে বললেন, শুধু কোনো সুন্দরী নারীর মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারিনি ; তাছাড়া আর কোথাও যাওয়া বাকি নেই।

ওর কথা শুনে আমি আরও হাসি। জিজ্ঞাসা করি, আপনি বিয়ে করেননি?

বিয়ে করলে কি এমন বুক ফুলিয়ে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারতাম?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বৃদ্ধ ডক্টর সরকার বললেন, একদিন জোর করে দু'বোতল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খাইয়ে দিও। আমার জীবনের সব কথা বলে দেব।

এর পরের চিঠিতে ডক্টর সরকারের কথা লিখব। অবাক হবে ওর জীবন কাহিনি জেনে।

দশ

বিদেশের মাটিতে পা দিয়েই এমন একজন সহৃদয় মানুষের দেখা পাব, তা কল্পনাও করিনি।

হ্যামস্টেড-এ ওঁর আস্তানায় ঢুকতেই ডক্টর সরকার আমাকে বললেন, ট্রিট দিস হাউস অ্যাজ ইওর ওন।

আমি শুধু একটু হাসি।

হাসি নয়। আজ থেকে এ সংসার তোমার, আমি তোমার প্রজা।

চা খেয়েই উনি সবকিছু আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, সারা জীবন একলা থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি। এখন মনে হয়, কেউ যদি আমার ওপর খবরদারি করত, তাহলে খুব ভালো লাগত।

কথাটা শুনেই আমি একটু আনমনা হয়ে গেলাম।

ডক্টর সরকার বললেন, যৌবনে বা প্রৌঢ় অবস্থায় নিঃসঙ্গ থাকা যায় কিন্তু বার্ধক্যে নিঃসঙ্গ থাকা সত্যিই অসহ্য।

এবার আমি বললাম, কোনো আত্মীয়স্বজনকে কাছে রাখেন না কেন?

আত্মীয়! ডক্টর সরকার যেন চমকে উঠলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আগে দু-একজন আত্মীয় ছিলেন, এখন আর কোনো আত্মীয় নেই।

আমি একটু এগিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললাম, হতাশ হবেন না, আমিও আপনার দলে।

উনি হঠাৎ ঘুরে বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আমিও এই রকমই আশা করছিলাম।

লন্ডনের জীবন বেশ ভালোভাবেই শুরু হল। ডক্টর সরকারের ফ্ল্যাটে তিনখানি ছোট বড় ঘর। কোন্‌টি ড্রইংরুম আর কোন্‌টি বেডরুম, তা বোঝা যায় না। সব ঘরেই হাজার হাজার বই। তিনটি ঘরেই ডিভান আছে। পড়াশুনা করতে করতে ক্লান্ত হলেই যে কোনো ঘরে ঘুমানো যায়। কাগজ কলম আর চশমা যত্রযত্র ছড়িয়ে রয়েছে। আছে আরও অনেক কিছু। তার মধ্যে সবার আগে চোখে পড়ল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন আর মার্টিনীর খালি বোতল। বুঝলাম, এই বোতলগুলো

শূন্য করে ডক্টর সরকার তাঁর মন পূর্ণ করার চেষ্টা করেন।

সন্ধের দিকে ডক্টর সরকার আমাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হ্যামস্টেড হিথ গেলেন। পাহাড়ের ওপর থেকে এমন সুন্দর বাগান দেখে খুব ভালো লাগল। ভেবেছিলাম আরো কিছুক্ষণ কাটাব কিন্তু উনি বললেন, চল, ওয়েল ওয়াক ঘুরে বাড়ি যাই।

ওয়েল ওয়াক! নাম শুনে কিছুই বুঝলাম না। চুপচাপ ওর সঙ্গে চললাম, হ্যামস্টেড হাই স্ট্রিটের কাছেই ওয়েল ওয়াক।

হঠাৎ ডক্টর সরকার আমাকে প্রশ্ন করলেন, বিখ্যাত কবি কীটস্ এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ?

হ্যাঁ।

উনি এখানে অনেক দিন ছিলেন।

আমি অবাক হয়ে চারদিক দেখি।

ডক্টর সরকার ডানদিকে হাত দেখিয়ে বললেন, ওদিকে খানিকটা গেলেই ওয়েস্ট ওয়ার্থ প্লেস। ওর বাগানে বসেই কীটস্ তাঁর বিখ্যাত কবিতা ODE TO A NIGHTINGALE লিখেছিলেন।

তাই নাকি?

ডক্টর সরকার আপন মনে আবৃত্তি শুরু করেন,

My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
or emptied some dull opiate to the drains
one minute past, and Le the-wards had sunk...

মনে পড়ে কবিতাটা?

মনে পড়ে তবে আপনার মতো মুখস্ত নেই।

আরেকটা কবিতার লাইন মনে পড়ছে।

A thing of beauty is a joy for ever;
Its loveliness increases; it will never
Pass into no thingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and...

ওকে কবিতাটা শেষ করতে না দিয়েই বললাম, আমরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা অত মুখস্থ করতে পারি না।

তোমরা যা পারো, তা আমরা পারি না।

আপনাকে দেখে মনে হয়, আপনি সবই পারেন।

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুঃখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে...

রবীন্দ্রনাথও আপনার মুখস্ত?

ওই সমুদ্র কি পাড়ি দেওয়া সম্ভব? তবে মাঝে মাঝে ওই সমুদ্রে স্নান করি।

বাড়িতে ফিরে এসে ডক্টর সরকার এক বোতল ফ্রেঞ্চ ওয়াইন নিয়ে বসলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কি অফার করতে পারি?

আমি হেসে বললাম, প্রয়োজন নেই।

এবার উনি হেসে বললেন, এসব সময় সাহচর্য পেলে অনেক বেশি আনন্দ হয়।

আমি তো আপনার সামনেই বসে আছি।

নো, নো, নট দ্যাট...

আপনি ড্রিঙ্ক করুন। আমি গল্প করছি।

এটা হুইস্কি নয়, ফ্রেঞ্চ ওয়াইন। তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

আমার মতো বাঙালি মেয়ের কাছে দুইই সমান।

প্লিজ ডোন্ট সে দ্যাট। ফ্রেঞ্চ ওয়াইন হচ্ছে শরতের মেঘ ; কোনো গ্লানি নেই, মালিন্য নেই, অহঙ্কার নেই। কালিদাসের মেঘদূতের মতো সে স্বচ্ছ প্রবাহিনী। আর হুইস্কি হচ্ছে...

শ্রাবণধারা!

ইয়েস, ইয়েস। যেমন গর্জন, তেমন বর্ষণ!

ডক্টর সরকার বোতল থেকে অমৃতধারা দুটি গেলাসে ঢালতে ঢালতে বললেন, যখন বিদেশে এসেছ, তখন একটু আধটু অভ্যেস থাকা ভালো।

চিয়ার্স!

চিয়ার্স!

গেলাসে এক চুমুক দিয়েই উনি আমাকে বললেন, তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য তোমাকে ওয়াইন খেতে দিলাম না।...

না, না, ও কথা আপনি বলবেন না।

তুমি সুন্দরী, শিক্ষিতা ও সর্বোপরি যুবতী। বেশি সহজ সরল হলে বোধহয় তোমার ক্ষতি হবে। তাই...

কিন্তু শুনেছি আমাদের দেশের চাইতে এসব দেশে আমার মতো মেয়ের পক্ষে একলা থাকা অনেক ভালো।

অনেক দিক থেকে ভালো হলেও কে যেন কোনো্ অসতর্ক মুহূর্তে তোমার ক্ষতি করবে, তা বলা মুশকিল।

আমি চুপ করে শুনি। ডক্টর সরকার একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, এখানে সবাই সম্পদ আর সম্ভোগের নেশায় মশগুল। এমন কি আমাদের দেশের মানুষও এখানে শুধু উপভোগ করতে চায়।

আমি এবারও কোনো কথা বলি না। উনি এক চুমুকে গেলাস খালি করে দিয়ে বললেন, দেখো মা, আজ তোমার বিদেশ বাসের প্রথম দিন। তোমাকে তাই সাবধান করে দিচ্ছি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে কাউকে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করো না।

এবার আমি বললাম, আপনি তো আছেন। আমার অত ভয় কী?

না, না, আমাকেও বিশ্বাস করো না। আজ না হোক, ভবিষ্যতে যে আমি তোমার ক্ষতি করব না, তা কে বলতে পারে?

অসম্ভব!

আবার গেলাস ভর্তি করে নিয়ে ডক্টর সরকার রুক্ষভাবে বললেন, অসম্ভব!

আমি আবার জোর করে বললাম, একশোবার অসম্ভব।

হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে ম্লান মুখে বললেন, না, না, অসম্ভব না। মানুষ যে কখন পশু হয়ে যায়, তা কেউ বলতে পারে না।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আমাকে দেখে কী খুব সাধু বলে মনে হয়?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সাধু বলে কেন মনে হবে? মনে হয়, আপনি একজন শিক্ষিত আদর্শবান মানুষ।

রাইট ইউ আর। সবাই তাই ভাবে, কিন্তু আমি তো জানি আমি কি রকম আদর্শবান।

তার মানে?

এককালে কত ছাত্রীকে যে উপভোগ করেছি...

সত্যি?

তোমাকে যখন মা বলে ডেকেছি, তখন তোমাকে মিথ্যা বলব না। তাইতো বলছিলাম, বাহির হইতে দেখো না এমন করে, আমায় দেখো না বাহিরে।

আমি একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করলাম, আমিও তো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি কিন্তু...

না, না, তারা নয়। যেসব ছাত্রীরা অধ্যাপনা করত বা আমার আন্ডারে রিসার্চ করত, তারা অনেকেই এই ব্যাচেলার অধ্যাপককে নিয়ে এমন মাতামাতি করত যে আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারতাম না।

কী আশ্চর্য!

আবার আশ্চর্য হচ্ছ? এই পৃথিবীতে কোনো কিছুতেই আশ্চর্য হবে না। আমরা যাদের বেশি ভালো মনে করি, তারা যে কত খারাপ, তা ভাবা যায় না ; আবার যাদের অত্যন্ত খারাপ ভাবি, তারা যে কত মহৎ হতে পারে, তা আমরা কল্পনাই করতে পারি না।

আমার গেলাস তখনও খালি হয়নি। আমার গেলাসের দিকে নজর পড়তেই উনি প্রশ্ন করলেন, একি! এখনও শেষ করোনি? চটপট শেষ করে নাও।

ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

আরেক রাউন্ড নেবে তো।

না, না, আমি আর নেব না।

তাই কি হয় মা? বুড়ো ছেলের অনুরোধ মাকে শুনতে হয়।

আমার লন্ডনবাসের প্রথম সন্ধ্যায় ওই বুড়ো ছেলের অনুরোধে আমাকে গেলাসের পর গেলাস ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খেতে হয়েছিল। উনিও খেয়েছিলেন। আর খেতে খেতে বলেছিলেন ওর নিজের কথা।

ডক্টর সরকার বাংলাদেশের এক বিখ্যাত জমিদার বাড়ির ছেলে। আজকের কথা নয়, প্রায় একশো বছর আগে ওদের জমিদারির আয় ছিল সাড়ে তিন লাখ টাকা। আর বড় জমিদার বাড়ির ছেলে হয়েও ডক্টর সরকারের বাবা জমিজমা বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। উনি পড়াশুনাই বেশি পছন্দ করতেন। অর্থের চিন্তা ছিল না বলে উনি কলকাতার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতেন এবং একে একে ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্র নিয়ে তিনটি এম. এ. পাশ করেন!

শুনেই আমি চমকে উঠি, বলেন কী?

ডক্টর সরকার একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলেন, বাবা সত্যি পড়াশুনা ভালোবাসেন। ওকে কোনোদিন তাস-পাশা খেলতে বা আড্ডা দিতে দেখিনি।

শুনেছি, কিছু কিছু জমিদার লেখাপড়া গানবাজনা নিয়েই জীবন কাটাতেন...

আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে উনি বললেন, আর কিছু কিছু জমিদার মদ-মেয়েছেলে

নিয়েই জীবন কাটাতেন।

হ্যাঁ, সেইরকমই শুনেছি।

আমার ঠাকুর্দা এই দ্বিতীয় ধরনের জমিদার ছিলেন।

আমি হাসি।

হাসছ? আমার ঠাকুর্দার ক'জন রক্ষিতা ছিল জানো? দশ-বারোজন।

আমি আবার হাসি। উনিও হাসতে হাসতে বলেন, ঠাকুর্দার দুজন রক্ষিতা আমাদের বাড়িতেই থাকতেন এবং আমার ছেলেবেলায় তাদের রাঙা ঠাকুমা আর গোলাপি ঠাকুমা বলে ডাকতাম।

আপনার আসল ঠাকুমা আপত্তি করতেন না?

না ; কারণ সব জমিদার বাড়িতেই এ সব অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ছিল।

আপনার বাবার মধ্যে তো এসব দোষ ছিল না।

একেবারেই না।

ডক্টর সরকার একবার মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, কিন্তু আমার মা বিশেষ ভালো ছিলেন না।

তার মানে?

তিনিও তো জমিদার বাড়ির মেয়ে ছিলেন। তাই আত্মভোলা পণ্ডিত স্বামী পেয়ে তিনি সুখী হতে পারেননি। আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা আর এক ম্যানেজারবাবুর সঙ্গেই...

বলেন কি?

হ্যাঁ, মা, ঠিকই বলছি। তাছাড়া মা ড্রিঙ্ক না করে থাকতে পারতেন না।

এসব কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম, আমাদের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়।

বিশ্বাস কর মা, আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলছি না।

না, না, আমি তা বলছি না।

আমাকে দেখতে ঠিক আমার বাবার মতো। যদি খুঁজে পাই তাহলে তোমাকে একটা অ্যালবাম দেখাবো। দেখবে, আমার আর বাবার চেহারায় বিন্দুমাত্র অমিল নেই।

তাই নাকি?

উনি আমার প্রশ্ন না শুনেই বললেন, আমার অন্য দুই ভাইকে দেখলেই বোঝা যাবে, তারা আমার বাবার সন্তান নয়।

আমি আর কোনো প্রশ্ন করি না, মন্তব্যও করি না।

এবার উনি হাসতে হাসতে বললেন, আমার চরিত্রের দশ আনা বাবার মতো আর ছ' আনা মায়ের মতো। লেখাপড়াও করেছি, জীবন উপভোগও করেছি।

বিয়ে করলেন না কেন?

ওই মায়ের সন্তান হয়ে বিয়ে করলেও কী সুখী হতে পারতাম?

বেশ কিছুক্ষণ কেউই কোনো কথা বললাম না। তারপর ডক্টর সরকারই বললেন, এয়ারপোর্টে তোমাকে দেখেই মা বলে কেন ডাকলাম, তা জানো?

কেন? বয়সে সন্তানতুল্যা বলে?

না। মনে হল তোমার মতো স্নিগ্ধ শান্ত একটা মেয়ে যদি আমার মা হতো, তাহলে বেশ হতো।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এবার যদি আমি বলি, বাহির হইতে দেখো না এমন করে, আমায় দেখো না বাহিরে।

আমার কথা শুনে উনিও হাসলেন। বললেন, তা বলতে পারো। তবে তোমাকে দেখেই মনে হয়, তোমার মধ্যে কোনো গ্লানি নেই, মালিন্য নেই।

যা দেখে মনে হয়, তাই কি ঠিক?

আমার মন বলছে, তুমি বড় পবিত্র। তাই তো তোমাকে মা বলে ডাকছি।

আমি মুখ নীচু করে চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুতেই বলতে পারলাম না, আপনার সব ধারণা ভুল, সব মিথ্যা। আমি ভালো নই। আমি দিনের পর দিন মদ্য পান করেছি, অবিবাহিতা হয়েও রাতের পর রাত একজন পুরুষের কামনা-বাসনার আগুনে নিজেকে স্বেচ্ছায় আহুতি দিয়েছি।

ভাই রিপোর্টার, সত্যি কথা বলা যে এত কঠিন, তা এর আগে জানতাম না। এই পৃথিবীর সব মানুষ সব সময় নিজেকে মহৎ বলে প্রচার করতে চায় কিন্তু প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটা সময় আসে, যখন যে জীবনের নিভৃততম গোপন কথা প্রাণপ্রিয় কাউকে বলতে চায়। তুমি আমার সেই প্রাণপ্রিয় ভাই ও বন্ধু। তাই না?

পরের দিন অনেক বেলায় দুজনের ঘুম ভাঙল। আমি আমার ঘর থেকে বেরুতেই ডক্টর সরকার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি মা, নতুন দেশে নতুন ছেলের বাড়িতে এসে ঘুম হয়েছিল তো?

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই এমন মিষ্টি সম্বোধনে আমার মন প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হেসে বললাম, ছেলের বাড়িতে এসেও মার ঘুম হবে না?

ডক্টর সরকার দু' এক পা এগিয়ে এসে আমার কপালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, চপটপ তৈরি হয়ে নাও। তারপর ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।

কোথায় যাবেন?

তোমাকে শহরটা দেখিয়ে দেব না?

আপনার কাজকর্মের ক্ষতি হবে না?

না, না, কিছু ক্ষতি হবে না।

ডক্টর সরকার হাতের ঘড়িটা দেখে বললেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেরুতে পারলে আমরা বার্কিংহাম প্যালেসের চেঞ্জিং দ্য গার্ডস্ দেখতে পাব।

আমরা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। বার্কিংহাম প্যালেসের সামনে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন সওয়া এগারোটা। চেঞ্জিং দ্য গার্ডস্ সাড়ে এগারোটায় কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ ভীড় হয়েছে। অধিকাংশই ট্যুরিস্ট। কিছু ইংরেজ তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছেন। ছেলেবেলা থেকে যে বার্কিংহাম প্যালেসের গল্প শুনেছি, পড়েছি, তার সামনে এসে বেশ লাগল, কিন্তু আরো ভালো লাগল চারপাশের মানুষ দেখে। হাসি খুশিতে প্রত্যেকটা মানুষ যেন আমাকে মুগ্ধ করল। এদের কেউই অসাধারণ নয়, সবাই সাধারণ মধ্যবিত্ত। অনেকে দেশে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা মানুষ দেখা তো দুর্লভ ব্যাপার। অনেকে হাসিঠাট্টা হৈ-হল্লোড় করলেও তাদের মুখ দেখলেই মনে হয় ওরা সবাই ক্লান্ত, শ্রান্ত, বোধহয় পরাজিতও। চেঞ্জিং দ্য গার্ডস খুব ভালো লাগল কিন্তু আরো বেশি ভালো লাগল এতগুলি হাসিখুশি ভরা মানুষ দেখে।

ডক্টর সরকার বললেন, রাজপ্রাসাদ হিসেবে বার্কিংহাম প্যালেস খুব বেশি পুরনো নয়।

আমি বললাম, কিন্তু এই বার্কিংহাম প্যালেস সম্পর্কে এত শুনেছি ও পড়েছি যে মনে হয়, এটা অনেক পুরনো।

রাজপ্রসাদ হিসেবে কুইন ভিক্টোরিয়াই এটা প্রথম ব্যবহার করেন ; তবে খুব নিয়মিত নয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সপ্তম এডওয়ার্ডই এটা প্রথম সব সময়ের জন্য ব্যবহার করেন।

আমাদের এখনকার রানি এলিজাবেথ দ্য সেকেন্ড তো এখানেই থাকেন?

হ্যাঁ, তবে রানি হবার পর তিন মাস পর্যন্ত উনি ক্লারেন্স হাউসে ছিলেন।

কন্‌স্টিটিউশন হিল আর ওয়েলিংটন আর্চ ঘুরে গ্রীনপার্কের পাশ দিয়ে রিজ হোটেল আর ডিভনশায়ার হাউস দূরে রেখে আমরা ল্যাঙ্কাস্টার হাউসের সামনে এলাম। ওখানে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলছিল বলে ভিতরে যাওয়া হল না। ডক্টর সরকার বললেন, প্যালেসগুলো বাদ দিলে লন্ডনে এত সুন্দর বাড়ি নেই।

এখানে কে থাকেন?

এখন এটা সরকারি অতিথিশালা। কখনও কখনও এখানে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হয়।

ল্যাঙ্কাস্টার হাউসের পাশেই সেন্ট জেম্‌স প্যালেস। ইতিহাসের পাতায় বার বার এর উল্লেখ।

এর পাশেই ক্লারেন্স হাউস।

ডক্টর সরকার বললেন, রানির মা কুইন এলিজাবেথ এখানেই থাকেন।

এবার উনি হঠাৎ হাসতে হাসতে বললেন, এভাবে যদি তোমাকে লন্ডন দেখাই তাহলে কতদিন লাগবে জানো?

কত?

মোটামুটি দু-তিন বছর।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তাহলে আমার আর এ শহর দেখা হল না।

উনি খুব জোরের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, কেন? তুমি কি এখানে বেশি দিন থাকবে না?

আমার অদৃষ্টে কি এত সুখ, এত ভালোবাসা সহ্য হবে?

ডক্টর সরকার হাসতে হাসতে আমার হাতটা ধরে বললেন, এ তো মায়ের মতো কথা হল না।

ওর কথায় আমার গাম্ভীর্য, আনমনা ভাব কোথায় ভেসে যায়। হাসি। বলি, না, আর বলব না।

এবার উনি বললেন, আজ আর ঘুরব না। কিছু খেয়ে-দেয়ে মার্বেল আর্চের ধারে বসে গল্প করি।

সত্যি বলছি ভাই রিপোর্টার, একজন বৃদ্ধ মানুষের সান্নিধ্য সাহচর্য হাসিঠাট্টা যে এত মধুর ও সুখের হতে পারে, তা আগে জানতাম না।

যৌবনে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের উপেক্ষা আর অনাদর করাই নিয়ম বলে জানতাম। আমাদের বয়সী একজন ছেলেমেয়েকেও কোনো বয়স্ক মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখিনি। ওরা চৈত্রের ঝরাপাতার মতো উপেক্ষিত, কিন্তু এই বৃদ্ধ ডক্টর সরকারকে দেখে জানলাম পরিণত বয়সে পরিণত মনের সৌন্দর্য ও মনের মাধুর্য সত্যি অনন্য। ভোরের সূর্য আর অস্তগামী সূর্যের রূপই যুগ যুগ ধরে অজস্র সহস্র কোটি মানুষকে বিমুগ্ধ করে রেখেছে। এই সূর্যের আলোতেই তো আমরা সবাই আলোকিত, আমাদের জীবন শক্তির প্রধান। তাই বোধহয় শৈশব আর বার্ধক্যের রূপ এত সুন্দর, এত মনোরম।

আজ হঠাৎ আমাকে জরুরী কাজে টরান্টো যেতে হচ্ছে। তাই বড্ড ব্যস্ত কিন্তু তবু তোমাকে চিঠি না লিখে পারলাম না।

তোমরা দুজনে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

শ্রদ্ধেয়া দিদি,

তোমার চিঠিগুলো পড়তে সত্যি খুব ভালো লাগছে। প্রথম যখন তুমি জানালে, চিঠি লিখে আমাকে তোমার বিচিত্র জীবন কাহিনি জানাবে, তখন বিশেষ উৎসাহবোধ করিনি। তোমার চিঠিগুলোর মধ্য দিয়ে শুধু তোমার বিচিত্র জীবন কাহিনিই জানতে পারছি না, জানতে পারছি মানুষের নানা রূপ। আরো কত কি।

তোমার প্রশংসা করার জন্য এ চিঠি লিখছি না। যে কালো মেয়েটা তোমাকে দেবতার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে আর তোমার ধারণা যার জন্য আমার সব কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, সেই মেয়েটা হঠাৎ একটা এরোগ্রাম এনে বলল, দিদিকে একটা চিঠি লেখ।

আমি বললাম, এই তো দু'তিন দিন আগে দুজনেই দিদিকে চিঠি দিলাম ; আজ আবার লিখব কেন?

ও হাসতে হাসতে বলল, খুব জরুরী দরকার।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, জরুরী দরকার?

ও হঠাৎ হাসতে হাসতে আমার মুখোমুখি বসেই বলল, আচ্ছা, তুমি তো স্বীকার কর রূপে-গুণে স্বভাব চরিত্রে দিদির কোনো তুলনা হয় না।

আমি দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ঠাট্টা করে বললাম, সুন্দরী, তুমি আমার জীবনে না এলে হয়তো তোমার এই দিদিকেই আমি...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও রাগে আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, এ ধরনের নোংরা কথা বললে আর কোনো দিন আমি তোমার কাছে আসব না।

দিদি, তুমি তো জানো, ওই কালো মেয়েটার বড় বেশি অভিমান। আর যখন অভিমান হয় তখন ওকে দেখতে আরও ভালো লাগে। আমি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর না করে পারি না। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

তারপর আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে চাপা গলায় বলল, আচ্ছা, দিদি তো এত কথা লিখছেন কিন্তু কোনোদিন কাউকে ভালোবেসেছেন কিনা তা তো লিখছেন না।

আমি তোমাকে সমর্থন করার জন্য বললাম, দিদি হয়তো কাউকে ভালোবাসেনি।

ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, অসম্ভব।

অসম্ভব কেন?

তুমি পুরুষ। মেয়েদের মনের কথা তুমি বুঝবে না। সব মেয়েই চায় তাকে কেউ ভালোবাসুক, আদর করুক। কোনো একজন পুরুষের কাছে সে অনন্যা হতে চায়।

তুমি চাও?

ও একটু শুকনো হাসি হেসে বলল, চাই না বলেই তো সমাজ সংসার উপেক্ষা করে নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দিয়েছি।

তোমাকে যখন দিদি বলে ডাকি, শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, তখন আমাদের প্রেম, ভালোবাসার বিশদ বিবরণ তোমাকে না জানানোই উচিত।

যাই হোক, সুন্দরী জানতে চায় তুমি কাকে ভালোবেসেছিলে? কেন তাকে বিয়ে করলে না? সবকিছু জানাবে ; তা নয়তো ওর মন ভরবে না আর আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পাগল করে তুলবে।

আমি ওকে বলেছিলাম, তুমিই দিদিকে লেখ।

ও বললে, না, আমি এসব কথা দিদিকে লিখতে পারব না। তুমিই লেখ।

দিদি, তুমি তো জানো, আমি ওর কথায় কুতব মিনারের ওপর থেকে লাফ দিতে পারি। তাই ওর কথা মতো এই চিঠি লিখছি। রাগ করো না।

আমাদের দুজনের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিও।

—তোমার রিপোর্টার ভাই

এগারো

তোমার এরোগ্রামের চিঠিটা পড়তে পড়তে শুধু হেসেছি। তোমার ওই কালো সুন্দরী মেয়েটাকে আমি দেখিনি কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ওকে তত বেশি ভালো লাগছে। বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়ে নয়, আমার মনের একান্ত শুদ্ধ ও নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে অনুভব করি, ও সত্যি কত গভীর ভাবে তোমাকে ভালোবাসে আর আমাকে শ্রদ্ধা করে। আমার শোবার ঘরে আর স্টাডিতে তোমাদের দুজনের দুটো বড় বড় ছবি আছে। আজ রবিবার। এই উইকএন্ডে কোথাও যাইনি। এই তিনখানা ঘরের অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যেই বন্দিনী আছি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য নিঃসঙ্গ বোধ করিনি। রবিবার তোমাদের দুজনের পুরনো চিঠিগুলো পড়েছি আর তোমাদের ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেছি। মাঝে মাঝে তোমাদের দুজনের ফটোটা বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছি।

যাই হোক, তোমার সুন্দরীকে বোলো, সে ঠিক কথাই বলেছে। এই পৃথিবীর সব মেয়ের মনেই স্বপ্ন থাকে, কোনো না কোনো পুরুষ আদর ভালোবাসায় তার মন প্রাণ ভরিয়ে দেবে। আমারও সে স্বপ্ন ছিল। বোধহয় সে স্বপ্ন এখনও মরে যায়নি। এখনও মাঝে মাঝে মনে হয়, মনের মানুষকে কাছে পেলে নিজেকে বিলিয়ে দিতাম, ভাসিয়ে দিতাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় হয় স্বপ্নভঙ্গের, বিশ্বাসঘাতকতার, পিছিয়ে আসি, নিজেকে গুটিয়ে নিই।

যে বয়সে অধিকাংশ মেয়ে স্বপ্ন দেখে, পৃথিবীকে রঙিন মনে করে, মনের মানুষ খুঁজে বেড়ায়, আমি তখন সত্যি স্বপ্ন দেখিনি। অবকাশ ছিল না। মার অসুস্থতা, বাবার মৃত্যু আমাকে এমনই বিব্রত করে তুলেছিল যে সমাজ সংসার পৃথিবী, সবকিছুই বিরূপ লেগেছিল। তারপর তো হঠাৎ একটা স্রোতের টানে ভেসে গেলাম। তখনও স্বপ্ন দেখার অবকাশ হয়নি। তারপর কিছুকাল নিজেই নিজেকে এমন ধিক্কার দিয়েছি যে জীবনের সূক্ষ্ম সুন্দর দিকগুলো মাথা উঁচু করতে পারেনি। লন্ডনে ডক্টর সরকারের স্নেহ ভালোবাসায় আবার আমি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখলাম। যে সবুজ শ্যামল পৃথিবী হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে আবার ফিরে পেলাম।

লন্ডন আসার মাস খানেক পরের কথা। এই মাস খানেকের মধ্যে লন্ডনের প্রায় সব দ্রষ্টব্যই আমার দেখা হয়েছে। শহরটাকে মোটামুটি চিনে ফেলেছি। এখন আমি টটেনহাম কোর্ট রোড টিউব স্টেশনে এসে নর্দান লাইনের গাড়ি দেখলেই উঠি না ; দেখে নিই এজঅয়ার যাবে কি না। হ্যামস্টেডে থাকি বলে হ্যামস্টেড স্টেশনেই নামি না, গোল্ডার্স গ্রীনে নামি।

সেদিন কি একটা কাজে যেন বেরিয়েছিলাম। কাজ শেষ করে একটু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকতেই বুঝলাম, ডক্টর সরকার ফিরে এসে কারুর সঙ্গে গল্প করছেন।

আমি আমার ঘরে স্কার্ফ কোট জুতো খুলে তোয়ালে দিয়ে মুখটা একটু মুছে নেবার পর ওঁর ঘরে যেতেই উনি বললেন, এসো মা, আমার এক ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

আমি দু-এক পা এগোতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন ও বললেন, আমি সন্দীপন ব্যানার্জি।

আমি কবিতা চৌধুরী।

ভাই রিপোর্টার, তোমার সুন্দরীকে বলো, এই সন্দীপন ব্যানার্জিকে দেখেই আমার ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল, বড় আপনলোক। হঠাৎ মুহূর্তের জন্য মনের মধ্যে অনেকগুলো স্বপ্ন একসঙ্গে ভীড় করে আমাকে আনমনা করে দিয়েছিল।

সন্দীপন বলল, বসুন।

সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর সরকার বললেন, হ্যাঁ, মা, বস।

বুঝলাম, স্বপ্নের ঘোরে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই ওদের কথায় একটু লজ্জিতই হলাম। আমি ওদের দুজনের মুখোমুখি বড় ডিভানের এক পাশে বসতেই ডক্টর সরকার হাসতে হাসতে বললেন, জানো মা, সন্দীপনরা চার ভাই বোনই আমার স্টুডেন্ট।

তাই নাকি? কিন্তু আপনি তো শুধু এরই প্রশংসা করেছেন ; অন্য ভাই বোনদের কথা তো কিছু বলেননি।

সন্দীপন হাসতে হাসতে বলল, প্রশংসা করার মতো ছাত্র তো আমি নই। স্যারের অনেক ছাত্রছাত্রীই আমার চাইতে অনেক ব্রিলিয়ান্ট।

আমিও হাসি। বলি, সেসব খবর আমি জানি না ; তবে আমার এই বুড়ো ছেলে আমার কাছে দিনের পর দিন আপনার প্রশংসা করেছেন।

ডক্টর সরকার হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা দুজনেই প্রশংসার যোগ্য অ্যান্ড আই অ্যাম প্রাউড অব ইউ টু।

দু-চার মিনিট আরো কথাবার্তা বলার পর আমি চা করতে গেলাম। হঠাৎ সন্দীপন প্যান্ট্রির সামনে এসে আমাকে বলল, শুধু চা খাওয়াবেন না ; আমার কিন্তু বেশ খিদে লেগেছে।

কি খাবেন? স্যান্ডউইচ?

আপত্তি নেই।

আর একটা কথা, আমি চা স্যান্ডউইচ খেয়েই চলে যাব না। একটু কাজে লন্ডন এসেছি। কয়েক দিন এখানে থাকব।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কে আপত্তি করছে? এ বাড়িতে আমার চাইতে আপনার দাবি অনেক বেশি।

ছিল ঠিকই কিন্তু আপনি এসে তো সব শেয়ার কিনে নিয়েছেন।

চা স্যান্ডউইচ নিয়ে ঘরে যেতেই ডক্টর সরকার আমাকে বললেন, সন্দীপ যখনই ব্রিস্টল থেকে আসে তখনই আমার এখানে থাকে। এবারও কয়েক দিন থাকবে।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, যিনি মায়ের বিরুদ্ধে ছেলের কাছে নালিশ করেন, তাকে থাকতে না দেওয়াই...

না, মা না, ও নালিশ করেনি।

সন্দীপন বলল, আমি এত বোকা না যে জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করব।

তিনজনেই হেসে উঠলাম। হাসি থামলে ডক্টর সরকার বললেন, সন্দীপ, অনেক কাল তোমার হাতের মাংস রান্না খাই না!...

স্যার, আজই খাওয়াব।

একটু ভালো ওয়াইনও তো খাওয়াবে?

নিশ্চয়ই খাওয়াবো স্যার। এবার সন্দীপন আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ, ডক্টর মিস্ চৌধুরী।

আমি আমার মনের ইচ্ছাটা ঠাট্টাচ্ছলে হাসতে হাসতে বললাম, আই উইল বি হ্যাপি উইথ ইওর কোম্প্যানি ওনলি!

সে-রাত্রে আমাদের বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। তিন চার রাউন্ড ড্রিঙ্ক করার পর বৃদ্ধ ডক্টর সরকার গাইলেন, 'আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান–'

ডক্টর সরকারের গান শেষ হতে না হতেই সন্দীপন শুরু করল, 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি–'

আমি আর ডক্টর সরকার হো হো করে হেসে উঠি।

সে রাত্রে হাসি-ঠাট্টা গান থামতে থামতে একটা দেড়টা বেজে গেল। তারপর খেতে বসেও ঘণ্টা খানেক সময় কেটে গেল।

পরের দিন সকালে আমিই প্রথম উঠলাম। ওরা দুজনে তখনও ঘুমুচ্ছেন। আমি সন্দীপনের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ওকে দেখলাম। মনে হল, ওর পাশে বসে ওকে ডাকি, সন্দীপ, উঠবে না? নাকি বিভোর হয়ে স্বপ্ন দেখছ? মনে মনে আরো কত কি বলেছিলাম মনে নেই কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে সন্দীপন হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে তাকাতেই আমি লজ্জায় ভয়ে সঙ্কোচে পা নাড়াতে পারলাম না। পাথরের মূর্তির মতো ওখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বোধহয় মিনিট খানেক এভাবেই কেটে গেল।

সন্দীপন বলল, গুডমর্নিং!

গুডমর্নিং।

অনেক বেলা হয়েছে বলে ডাকতে এসেছেন?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না। আপনাকে দেখছিলাম।

ও খুশির হাসি হেসে চোখ দুটো বড় করে বলল, আমি কি টাওয়ার অব লণ্ডন যে আমাকে দেখছিলেন?

দেখছিলাম, কাল রাত্রের আপনি আর এখনকার আপনার মধ্যে কত পার্থক্য।

তাই নাকি?

আমি শুধু মাথা নাড়লাম।

কি পার্থক্য দেখলেন?

এখন আপনাকে কত শান্ত, স্নিগ্ধ লাগছে।

আর কাল রাত্রে?

সে তো কালবৈশাখী!

সন্দীপন হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু ওই কালবৈশাখীর ঝড়েই সব ধুলো বালি মালিন্য উড়িয়ে নিয়ে যায়।

আর আমি কথা বাড়ালাম না। বললাম, উঠে পড়ুন। আমি চা করছি।

ডক্টর সরকার তখনও ঘুমুচ্ছিলেন। আমরা দুজনে চা খাচ্ছিলাম। চা খেতে খেতে আমি ওকে বললাম, এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। আমাকে একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করে দিন।

আপনি ইচ্ছে করলে তো আজই চাকরি পেতে পারেন।

ইচ্ছা তো করছে কিন্তু পাচ্ছি কই।

একটু চুপ করে থাকার পর সন্দীপন জিজ্ঞাসা করল, বাইরে যেতে আপত্তি আছে?

বাইরে মানে?

লন্ডনের বাইরে।

বিন্দুমাত্র না।

ডক্টর সরকার আপত্তি করবেন না তো?

উনি কেন আপত্তি করবেন? একটু থেমে আমি বললাম, তবে ওঁর পরামর্শ নেওয়া আমার কর্তব্য।

একশোবার।

পট থেকে আরো খানিকটা চা নিজের কাপে ঢালতে ঢালতে উনি বললেন—ঠিক আছে, আমিই স্যারের সঙ্গে কথা বলব।

সেদিন নয়, পরের দিন রাত্রে খাবার টেবিলে ডক্টর সরকার আমাকে বললেন, মা, সন্দীপন তোমার জন্য একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থা করেছে।

আমি একটু অবাক হবার ভান করে বললাম, তাই নাকি?

আমি দেখলাম, সন্দীপন আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। কিন্তু ডক্টর সরকার তা লক্ষ্য না করেই বললেন, হ্যাঁ ; তবে এখানে নয়, ওদের বিস্টলে।

এবার আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মতো আছে?

একশোবার। বুঝলে মা, জীবনে কোনো সুযোগই দু'বার আসে না।

আপনার মতো থাকলে নিশ্চয়ই যাব।

তবে মাঝে মাঝে উইক-এন্ডে এসো। তা নয়তো এই বুড়ো ছেলেকেই মায়ের কাছে ছুটতে হবে।

নিশ্চয়ই আসব।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা তিনজনে তিন ঘরে শুতে গেলাম। আমি, আমার ঘরে গিয়ে শাড়ি-টাড়ি ছেড়ে নাইটি পরলাম। চুল ব্রাশ করছি, এমন সময় দেখি আমার ঘরের দরজার নীচে দিয়ে একটা খাম এগিয়ে আসছে। প্রথমে একটু অবাক হলেও পর মুহূর্তে বুঝলাম, নিশ্চয়ই সন্দীপন দিয়ে গেল। যা ভেবেছিলাম, তাই। খুলে দেখি ছোট্ট একটা কাগজে লেখা, 'কদিন ধরেই আপনাকে একটা কথা বলতে চেষ্টা করছি কিছুতেই বলতে পারছি না।'

ছোট্ট কাগজখানা হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে হাসছিলাম আর ভাবছিলাম নানা কথা। তারপর ওই কাগজেরই উল্টো দিকে লিখলাম, 'সে কথা কী শুধু আমাকে বলতে হবে?'

দরজার নীচে দিয়ে কাগজখানা ওপাশে দিয়ে দেবার এক মিনিটের মধ্যেই জবাব এলো, 'হ্যাঁ, শুধু আপনাকেই সে কথা বলব!'

'ঠিক আছে, কাল বলবেন।'

পরের দিন সকালে সন্দীপন ব্রেকফাস্ট না খেয়েই বেরিয়ে গেল। খানিকটা পরে ব্রেকফাস্ট শেষ করেই ডক্টর সরকার বেরিয়ে গেলেন! তার ঘণ্টা খানেক পরেই সন্দীপন ফিরে এলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, প্রফেসর ব্রুকস-এর সঙ্গে দেখা হল?

হ্যাঁ। স্যার কখন ফিরবেন?

বিকেলের দিকে ফিরবেন।

কিন্তু...আমার কাজ হয়ে গেছে। তাই ভাবছিলাম, দুপুরেই চলে যাব।

ডক্টর সরকারের সঙ্গে দেখা না করে যাবেন কেমন করে?

যাব না?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, না।

কাল চলে যাব?

এখানকার কাজ যখন হয়ে গেছে তখন আর শুধু শুধু সময় নষ্ট করবেন কেন?

সন্দীপন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, না, সব কাজ হয়নি ; একটা কাজ বাকি আছে। সে কাজটা সেরে নিন।

আপনি অনুমতি দিচ্ছেন?

আমি অনুমতি দেব?

হ্যাঁ, সে কাজটা আপনার সঙ্গে।

বলুন, কী কাজ।

সন্দীপন কোনো কথা না বলে আমার দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিতেই আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেলাম। ও দুহাতে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

অনেক রাত হয়েছে। শুতে যাচ্ছি। পরের চিঠিতে বাকি ইতিহাস জানাব।

তুমি আর তোমার সুন্দরী আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

বারো

আমার কথা শুনলে তোমরা দুজনে হয়তো হাসবে, কিন্তু ভাই বিশ্বাস কর, সেদিন সন্দীপনের বুকের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন এই নির্মম রূঢ় পৃথিবী ছেড়ে আনন্দময় অমরাবতীতে চলে গেলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, আমি লাল বেনারসী পরেছি, মাথায় ওড়না। সন্দীপন আমাকে তার জীবনবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু করে সাতপাক ঘুরছে। আমার গলায় মালা দিল। আমি পলকের জন্য বিমুগ্ধ মনে ওকে দেখলাম। সানাই শাঁখ আর উলুধ্বনিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে মাতাল করেছে আমাদের, চারপাশের মানুষকে। সন্দীপন একটু হাসল। দুটি স্বপ্নাতুর চোখ দিয়ে আমাকে ফিস ফিস করে বলল, কবিতা, আমার সর্বস্ব তোমাকে দিলাম।

ওই কয়েকটা অবিস্মরণীয় মুহূর্তের মধ্যেই আমি অনুভব করলাম, বাসর রাত্রির আনন্দ ফুলশয্যার উন্মাদনা। দ্বিধা, সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে আমি যেন আনন্দ-সমুদ্রে স্নান করলাম। মনে মনে কত কথা বললাম, কত কথা শুনলাম।

জানো কবিতা, তোমাকে প্রথম দেখেই বুঝেছিলাম, ঈশান কোণের মেঘের মতো তুমি একদিন আমার সারা আকাশ ভরিয়ে দেবে।

আমিও জানতাম, এই দিগন্তবিহীন অনন্ত সমুদ্রে একদিন আমি নিজেকে তলিয়ে দেব।

আর কি জানতে?

জানতাম, সেই সমুদ্রের অতল গহ্বর থেকে সব ধনরত্ন তুলে নিয়ে আমার শূন্য মন পূর্ণ করব।

স্বপ্ন দেখলাম আরো অনেক কিছু। আমি যন্ত্রণায় ছটফট করছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক অভাবিত সম্ভাবনায় আমি মাঝে মাঝে সব যন্ত্রণা ভুলে যাচ্ছি। আবার যন্ত্রণার বেগ বাড়তেই আমি চিৎকার করে বললাম, সন্দীপন, আমাকে একটু জড়িয়ে ধর, আমাকে একটু আদর কর। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

নিদারুণ দীর্ঘ গ্রীষ্মের পর আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ দেখেই ভেবেছিলাম, এই

তাপক্লিষ্ট পৃথিবীতে এবার সবুজের মেলা বসবে।

হঠাৎ সন্দীপন দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বলল, কবে ব্রিস্টল আসছ?

আমি কপট গাম্ভীর্য আনলেও চোখে-মুখে আমার মনের আনন্দের সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠল। বললাম, সত্যি আসব?

ও আমার কানে কানে বলল, না।

তাহলে কালই আসছি।

দুজনেই প্রাণভরে হেসে উঠলাম।

ভাই রিপোর্টার, তুমি তোমার সুন্দরীকে বোলো, সেদিন আনন্দে আর চাপা উত্তেজনায় আমি যেন চঞ্চলা ষোড়শী হয়ে গিয়েছিলাম। সন্দীপনের স্পর্শে, ওই কয়েক মুহূর্তের নিবিড় সান্নিধ্যে আমি মৃগনাভী হরিণীর মতো পাগল হয়ে উঠেছিলাম। আমার জীবনে এমন আনন্দময় দিন আর আসেনি। এমন পরিপূর্ণ দিনও আমার জীবনে আর আসেনি।

অনেক বেলায় দুজনে খেতে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এতকাল বিয়ে করনি কেন?

সন্দীপন নির্বিবাদে উত্তর দিল, তোমার সর্বনাশ করব বলে।

আমি বুকে ভরে নিশ্বাস নিয়ে বললাম, ঠিক বলেছ। আমিও বোধহয় তোমারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

বিকেলবেলায় ডক্টর সরকার ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই সন্দীপন চলে গেল। যাবার সময় শুধু বলল, ব্রিস্টলে আসুন। কোনো অসুবিধে হবে না। তবে আসার আগে একটা টেলিফোন করবেন।

সন্দীপন চলে যাবার সময় আমার মন এমনই খারাপ হয়েছিল যে আমি বিশেষ কোনো কথা বলতে পারলাম না। ও আমার মনের অবস্থা বুঝেছিল বলেই ডক্টর সরকারকে প্রণাম করেই হ্যান্ডসেক করার জন্য আমার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিল। আমিও হাত বাড়িয়ে দিলাম। ও আমার হাতটা শুধু একটু টিপে দিল।

সন্দীপনের অভাব এত বেশি অনুভব করছিলাম যে রাত্রে খাবার সময় ডক্টর সরকারকে বলেই ফেললাম, আজ হঠাৎ বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

ঠিক বলেছ মা। ও যখনই চলে যায় তখনই আমার মন খারাপ হয়!

হ্যাঁ, ক'দিন বেশ জমিয়ে রেখেছিলেন।

ও সত্যি বড় আমুদে ছেলে।

ডক্টর সরকার একটু হেসে বললে, সন্দীপন শুধু আমার ছাত্র নয়, বাট এ ফ্রেন্ড অ্যাজ ওয়েল।

আমি হেসে বললাম, আমিও তাই দেখলাম। একটু থেমে, একটু পরে বললাম, ওদের সব ভাইবোনই বুঝি আপনার ছাত্র?

ওরা সাত ভাইবোন। তার মধ্যে তিন বোন আর সন্দীপনই আমার স্টুডেন্ট। ডক্টর সরকার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, সন্দীপনের বড়দি আমার খুবই প্রিয় ছাত্রী ছিল।

আমি ইঙ্গিতটা বুঝলেও গম্ভীর হয়ে বললাম, তাই নাকি?

উনি একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, সি ইজ এ ডেঞ্জারাস গার্ল!

ডেঞ্জারাস মানে?

যে রকম সর্বনাশা সুন্দরী, সেই রকম বুদ্ধিমতী ; অ্যান্ড সি ইজ এ ভেরি ফাস্ট গার্ল!

এবার আর আমি হাসি চেপে রাখতে পারি না। হেসে বলি, তাই নাকি?

হ্যাঁ মা। কয়েকটা বছর ওকে নিয়ে খুবই আনন্দে কাটিয়েছি।

উনি কি সন্দীপনবাবুর চাইতে অনেক বড়?

হ্যাঁ, অনেক বড়। সি মাস্ট বি অ্যাবাউট ফিফটি-ফাইভ বাই নাউ।

উনি এখন কোথায় আছেন?

কলকাতায়।

আপনার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে?

ডক্টর সরকার হেসে বললেন, এখনও মাসে একখানা প্রেমপত্র লেখে।

আপনি লেখেন?

লিখি বৈকি।

দেখাশুনো?

কলকাতায় গেলেই দেখা হয়। উনি একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, এখনও ওর রূপ দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে।

বিয়ে করেছেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, বিয়ে করেছে। বেশ সুখেই ঘর-সংসার করছে।

সন্দীপনবাবুর অন্যান্য ভাইবোনেরা...

ওদের বাড়িটা যেন অভিশাপগ্রস্ত। সন্দীপনের বড়দা ক্যান্সারে ভুগে ভুগে মারা গেলেন এই বছর তিনেক আগে। মেজদা মারা গিয়েছেন মোটর অ্যাকসিডেন্টে। এছাড়া তিনটি বোন বিধবা।

ইস!

এইসব কারণেই তো সন্দীপন বিয়ে করল না।

এরপরই হঠাৎ ডক্টর সরকার বললেন, ও যদি বিয়ে করতে রাজি হয়, তাহলে আমি ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব।

আমি হাসি।

না, মা, হাসির কথা নয়! তোমার মতো সন্দীপনও বড় নিঃসঙ্গ। তাছাড়া ছেলেমেয়ে হিসেবে তোমাদের দুজনেরই তুলনা হয় না।

আমি চুপ করে বসে থাকি। কোনো কথা বলি না।

উনিই আবার বললেন, ব্রিস্টলে তোমার সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে যদি ওর মতের পরিবর্তন হয়, তাহলে তুমি মা ওকে বিয়ে করো। আমি বলছি, তোমরা নিশ্চয়ই সুখী হবে।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ থাকার পর ডক্টর সরকার বললেন, দেখ মা, এই পৃথিবীর সমাজ-সংসার এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে একা থাকা বড় কঠিন। আমার কথাই ধর। আই হ্যাড প্লেন্টি অব সেক্স কিন্তু কোনো নারীর সান্নিধ্য, সাহচর্য আর ভালোবাসা পেলাম না। আমি একটা ক্যাক্টাস হয়েই রইলাম।

ডক্টর সরকারের কথাগুলো শুনে আমার মনের মধ্যে স্বপ্নের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলাম না। মাথা নীচু করে বসে রইলাম। তবে মনে মনে অনেক কথা বললাম। বললাম, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আপনি যা ভেবেছেন, যে স্বপ্ন দেখছেন, আমরাও তাই ভেবেছি। আর বললাম, সন্দীপন দুহাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে টেনে নেবার অনেক আগেই আমি মনে মনে উপলব্ধি করেছিলাম, সন্দীপনই আমার জীবন দেবতা।

ডক্টর সরকার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কবে ব্রিস্টল যেতে চাও?

ভাবছি, সপ্তাহখানেক পরে যাব।

প্রত্যেক শুক্রবার বিকেলে আসবে তো?

আসব।

হ্যাঁ এসো। আবার সোমবার সকালে ফিরে যেও। সঙ্গে সন্দীপনকে আনতে পারলে আরো ভালো হয়।

আমি হাসি।

ডক্টর সরকার একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, না, না, মা, হাসিরা কথা নয়। আমার গর্ভধারিণীর চরিত্র ভালো ছিল না বলে আমি সারাজীবন মেয়েদের শুধু উপভোগের সামগ্রী ভেবেছি, কিন্তু হেরে গেলাম শুরু তোমার কাছে।

ওঁর দুটো চোখ ছলছল করে উঠল। গলার স্বরও ভারি হয়ে গেল। বললেন, মা পেয়েছিলাম কিন্তু মাতৃস্নেহ পাইনি ; নারী পেয়েছি কিন্তু নারীর ভালোবাসা পাইনি। এখন এই বুড়ো বয়সে সেই মাতৃস্নেহ আর ভালোবাসা পাবার জন্য বড় লোভ হয়েছে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে ওঁর পাশে দাঁড়ালাম। দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে ওঁর মাথার ওপর থুতনি রেখে বললাম, এখন তো মা পেয়েছেন ; আবার দুঃখ কিসের?

নিশ্চয়ই পেয়েছি, কিন্তু তুমি তো চলে যাচ্ছ।

আপনি বারণ করলে যাব না।

না, মা, তা হয় না।

এবার আমি ওঁর হাত ধরে বললাম, চলুন, আমি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ডক্টর সরকার শুয়ে পড়েন। আমি ওঁর পাশে মাথায় হাত দিই। ছোট্ট অসহায় শিশুর মতো উনি আমার কোলের ওপর হাত রেখেই ঘুমিয়ে পড়েন। তবু আমি উঠতে পারি না। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

কতক্ষণ ওইভাবে বসেছিলাম, জানি না। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতেই উঠে গেলাম।

হ্যালো!

আমি সন্দীপন।

আমি হেসে বললাম, এত রাত্রে টেলিফোনের বেল শুনেই বুঝেছি, ডক্টর সরকারের পাগল ছাত্রের টেলিফোন।

আমি পাগল?

পাগল না হলে আমাকে পাগল করতে পারো?

যাক, শুনে খুশি হলাম।

খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

হাফ বট্‌ল হুইস্কি শেষ করেছি।

হুইস্কি খেলেই পেট ভরবে?

এতদিন ভরতো, কিন্তু আজ ভরলো না।

কেন?

আজ মনে হচ্ছে, বোধহয় হুইস্কির বোতলে জল ছিল।

তার মানে?

রোজ নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না।

এভাবে ড্রিঙ্ক করলে আমি আসছি না।

তুমি এলে আমি আর এত ড্রিঙ্ক করব না।

ঠিক বলছ?

কবিতা, যেদিন দেখবে আমি তোমাকে একটা মিথ্যে কথা বলছি, সেদিনই তুমি চলে যেও। আমি বাধা দেব না।

তুমিও মিথ্যে বলবে না, আমিও চলে আসব না।

এবার সন্দীপন জিজ্ঞাসা করল, স্যার কি ঘুমোচ্ছেন?

একটু আগেই ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।

তুমি কি নাইটি পরেছ?

আমি হাসি। বললাম, কেন?

তোমার ওই লাল নাইটি দেখলে...সন্দীপন কথাটা শেষ করল না।

আমি জানতে চাইলাম, আমার নাইটি দেখলে কি হয়?

ফুলশয্যার দিন বলব।

আমি হাসতে হাসতে বলি, এতদিন অপেক্ষা করতে হবে? তার আগে...

এতদিন অপেক্ষা করতে না চাইলে আগেই ফুলশয্যা হবে। তারপর সময় মতো বিয়ে-টিয়ে করা যাবে।

এবার তুমি মার খাবে।

সন্দীপন আর বিশেষ কিছু বলল না। শুধু বলল, অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়। গুড নাইট।

পরের ক'টা দিন আমি যেন সন্দীপনের স্বপ্নের বিভোর হয়েই রইলাম। সব সময় শুধু ওর কথা ভাবি ; প্রতি মুহূর্তে ওকে চোখের সামনে দেখি। ডক্টর সরকার বাড়িতে না থাকলে আমি মনে মনে ওর সঙ্গে কথাও বলি।

সন্দীপন, উঠবে না? লক্ষ্মীটি উঠে পড়। অনেক বেলা হয়ে গেছে। আর ঘুমোতে হবে না।...কি? উঠবে না? বেশ, আমি চলে যাচ্ছি।...আঃ। ধরো না। আমি সত্যি যাচ্ছি। আমার অনেক কাজ আছে।

ওইসব স্বপ্ন দেখি আর আমি আপন মনেই হাসি। ভাবি, আমি কি পাগল হলাম? না, না, পাগল হব কেন? যাকে ভালোবাসি তাকে স্বপ্ন দেখব না? নিশ্চয়ই দেখব, একশোবার দেখব।

ভাই রিপোর্টার, ভালোবাসা বহু ব্যবহৃত শব্দ। যেদিকে তাকাই সেদিকেই ভালোবাসার ছড়াছড়ি। শুনি, সব ছেলেমেয়েরাই প্রেমে পড়ে। কিন্তু সত্যি কি সবাই ভালোবাসতে পারে? সবাই কি প্রেমে পড়তে পারে? বোধহয় না। দেহে যখন বিপ্লব আসে, তখন স্বপ্ন দেখবেই। তখন সমস্ত পৃথিবীতেই রামধনুর রঙ দেখা যায় কিন্তু ভালোবাসা তো স্বপ্ন নয়। পৃথিবীকে রঙিন দেখার জন্যই তো প্রেম নয়। ভালোবাসা মানুষকে দেবতা করে ; প্রেম আনে অমরত্ব। তাই তো আমরা শ্রীকান্তকে ভুলতে পারি না, রাজলক্ষ্মীকে সবাই ভালোবাসি। যে ভালোবাসা নারী-পুরুষকে শুধু বিয়ের বন্ধনে বাঁধে, শুধু উপভোগের অধিকার দেয়, সে ভালোবাসায় প্রেম নেই এবং সেইজন্যই আমাদের ঘরে ঘরে এত অশান্তি, এত সংঘাত, এত দ্বন্দ্ব।

তুমি বিশ্বাস কর, আমি শুধু কামনা-বাসনা লালসার তৃষ্ণা মেটাবার জন্য সন্দীপনকে ভালোবাসিনি। যে কোনো পুরুষকে দিয়েই এ তৃষ্ণা মেটানো যায় কিন্তু যে কোনো পুরুষকে কি ভালোবাসা যায়? না, তা সম্ভব নয়। আমি আমার সমস্ত-অনুভূতি দিয়ে সন্দীপনকে নিজের মধ্যে বরণ করেছিলাম, চেয়েছিলাম সমস্ত সত্ত্বা বিলীন করে ওর মধ্যে মিশে যেতে।

দিন দুই পরের কথা। আমি ব্রিস্টল যাবার জন্য কেনাকাটা করতে অক্সফোর্ড সার্কাসের দিকে গিয়েছিলাম। বৃষ্টির জন্য ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল। বাড়িতে ঢুকে ডক্টর সরকারের মুখ দেখেই ঘাবড়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে আপনার? এভাবে মুখ কালো করে বসে কেন?

উনি মুখ নীচু করে বললেন, মনটা বড় খারাপ।

কেন? কি হয়েছে?

সন্দীপন টেলিফোন করে একটা দুঃসংবাদ জানালো।

আমি প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি দুঃসংবাদ জানালো?

ওর সব চাইতে ছোট বোনটি বিধবা হয়েছে।

ইস!

আমাকে আর প্রশ্ন করতে হয় না। ডক্টর সরকার নিজেই বললেন, এই ছোটবোনকে সন্দীপন কি অসম্ভব ভালোবাসত তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বাবা-মা মারা যাবার পর সন্দীপনই ওর বাবা-মা ছিল। বাড়িতে তিন-চারটে ঝি-চাকর থাকা সত্ত্বেও সন্দীপন ওকে নিজের হাতে চান করাতো, খাওয়াতো। ছোট বোন পাশে না শুলে সন্দীপন ঘুমুতে পারত না।

আমি বোবার মতো দাঁড়িয়ে চোখের সামনে যেন ওইসব দৃশ্য দেখছি।

ডক্টর সরকার থামেন না। বলে যান, বিলেত আসার বছর খানেক আগে সন্দীপনই ওর বিয়ে দিল, কিন্তু বিধাতা পুরুষ ওর স্বপ্ন চুরমার করে দিলেন।

আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কখন খবর পেলেন? তুমি বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টেলিফোন এলো।

উনি কি বললেন?

শুধু সর্বনাশা সংবাদটা জানিয়েই টেলিফোন রেখে দিল।

আর কিছু বললেন না?

না। বলার মতো অবস্থা ওর ছিল না। একটু থেমে ডক্টর সরকার বললেন, আমি অনেকবার ওকে ফোন করলাম কিন্তু কোনো জবাব পেলাম না।

আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে ডক্টর সরকার বললেন, নিশ্চয়ই বেঢপ মাতাল হয়ে পাগলের মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কথাটা শুনেই আমার সমস্ত বুকটা জ্বলে-পুড়ে গেল। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে চাইলাম, ছুটে গিয়ে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি, চোখের জল মুছিয়ে দিই, কিন্তু না ভাই, সে সুযোগ এলো না। কোনোদিনও আসবে না।

রাত্রে আমরা দুইজনেই আরো অনেকবার সন্দীপনকে ফোন করলাম কিন্তু ওকে পেলাম না। অনেক রাত্রে শুতে যাবার আগে ডক্টর সরকার আমাকে বললেন, একটু সজাগ থেকো। ও হয়তো পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে এখানে এসে হাজির হতে পারে।

সন্দীপনের প্রতীক্ষায় সারা রাত জেগেই রইলাম, কিন্তু না, সে এলো না। একেবারে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—হঠাৎ ডক্টর সরকারের চিৎকার শুনেই পাগলের মতো লাফিয়ে উঠলাম। ওঁর কাছে ছুটে যেতেই উনি আমাকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মা, আমার সন্দীপন নেই!

ডক্টর সরকারের আশঙ্কাই ঠিক হল। সন্দীপন বেঢপ মাতাল হয়ে পাগলের মতো গাড়ি নিয়ে ঘুরছিল সারা শহর। শেষ রাত্তিরের দিকে মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট করে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

ভাই রিপোর্টার, শুনলে আমার প্রেমের কাহিনি? কেমন লাগল? এ সংসারে কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা ধুলো হাতে নিলে সোনা হয় ; আবার কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের ছোঁয়ায় সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আমার এই সুন্দর দেহটার মধ্যে একটা অভিশপ্ত আত্মা লুকিয়ে আছে। তাই তো আমার দ্বারা এ পৃথিবীর কোনো মানুষের কোনো কল্যাণ হবে না, হতে পারে না। অসম্ভব।

তোমার সুন্দরীকে বোলো, পরবর্তীকালে আমার এই দেহটা অনেক পুরুষ উপভোগ করেছে। যাদের এ দেহ দিয়েছি, তাদের সবাইকে আমি ঘেন্না করি কিন্তু শুধু সন্দীপনের ওপর অভিমান করে এ দেহ তাদের বিলিয়ে দিয়েছি। পরে কেঁদেছি। অবোধ শিশুর মতো হাউ হাউ করে কেঁদেছি। হাত জোড় করে হাজার বার সন্দীপনের কাছে ক্ষমা চেয়েছি।

সন্দীপন মারা গেছে কিন্তু হারিয়ে যায়নি। তাকে আমি সযত্নে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। সেখান থেকেও কি সে পালিয়ে যাবে? না, তাকে আমি কোথাও যেতে দেব না। সে চিরদিনের, চিরকালের জন্য শুধু আমার।

আর লিখতে পারছি না। আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো। দোহাই তোমাদের, আর কোনোদিন আমার সন্দীপনের কথা জানতে চেও না!

আমার প্রাণভরা বুকভরা ভালোবাসা নিও।

তেরো

প্রিয়বরেষু ভাই রিপোর্টার,

সন্দীপনকে হারাবার পর হঠাৎ পৃথিবীটা বদলে গেল। শুধু আমার নয়, ডক্টর সরকারেরও। দুজনেই ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতাম ; একেবারেই বেরুতাম না। সারাদিন দুজনের কেউই কথা বলি না। খাবার টেবিলেও দুজনে মুখ নীচু করে খেয়েই উঠে পড়ি। শুধু তাই নয়, শোকে দুঃখে কেউই কারুর দিকে তাকাতে সাহস করি না। দুজনে দুজনের ঘরে চুপচাপ বসে থাকি ; হয়তো শুয়ে পড়ি, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। চোখের পাতা ভারি হয়ে এলেই চমকে উঠি। ওই সামান্য ক'টা দিনের সুখস্মৃতি যক্ষের ধনের মতো বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। বার বার সে স্মৃতি রোমন্থন করি।

কত রাত পর্যন্ত জেগে থাকি, তা বুঝতে পারি না, কিন্তু যতক্ষণ জেগে থাকি ততক্ষণই বুঝতে পারি ডক্টর সরকারও ঘুমোননি। মাঝে মাঝেই ওঁর পায়চারি করার শব্দ শুনতে পাই। যে ডক্টর সরকার প্রতি সন্ধেয় মদের বোতল নিয়ে বসতেন, সেই মানুষটা হঠাৎ মদ স্পর্শ করাও ছেড়ে দিলেন। তারপর দিন দশেক পরে উনি কিছু না বলেই সন্ধের সময় বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন মাঝ রাত্তিরের পর পাঁড় মাতাল হয়ে। আমি তো অবাক। আমাকে দেখেও যেন দেখলেন না। আপন মনে এলোমেলো করে গাইছেন, 'কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে

রে...।'

ওঁকে যত দেখি, আমার মন তত খারাপ হয়। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু জোরে কাঁদতে পারি না। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদি। কাঁদেন ডক্টর সরকারও। তিনি আমারই মতো চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেন।

এর দিন দশেক পরে ডিনার খেতে খেতে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, একটা কথা বলবে? তোমার আর সন্দীপনের বিয়ের তারিখ কী ঠিক হয়েছিল?

আমি লুকোবার চেষ্টা না করে বললাম, না, বিয়ের কোনো কথা হয়নি, তবে আমরা দুজনেই জানতাম, আমরা বিয়ে করব।

অনেকক্ষণ উনি কোনো কথা বললেন না। তারপর আপন মনে একটু হেসে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই এর আগে কাউকে ভালোবাসনি?

না।

উনি খুব জোর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, লোকে বলে প্রথম ভালোবাসা কখনও সাকসেসফুল হয় না। কথাটা বোধহয় ঠিকই। তারপর উনি মুখ নীচু করে বললেন, আমি তো সেই জ্বালাতেই সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরছি। তুমিও এ জ্বালা থেকে মুক্তি পাবে না।

এ কথার কী জবাব দেব—আমি চুপ করে বসে থাকি।

ডক্টর সরকার একটু শুকনো হাসি হেসে বললেন, জানো মা, ফার্স্ট লাভ সাকসেসফুল না হবার জন্যই আমি এত খারাপ হয়ে গেলাম। সহজ ভাবে মানুষের জীবন না এগুতে পারলেই পারভার্টেড হয়।

এইভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে মাসখানেক পার হল। ডক্টর সরকার পুরোদমে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। আমিও বাড়ির মধ্যে আর নিজেকে বন্দিনী রাখতে পারি না ; বেরিয়ে পড়ি।

সেদিনও বেরিয়েছিলাম। একদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঢুকে পড়লাম। বইপত্তর ওলটাতেই সারাটা দিন কেটে গেল। ঠিক বেরুবার মুখে একটি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন কী? আপনার নামই কী কবিতা?...

হ্যাঁ।

আমি তন্ময় মুখার্জি।

আমি হাত জোড় করে নমস্কার করতেই উনি বললেন, আমিও আপনার কনটেম্পোরারি—তবে ইতিহাসের ছাত্র। তিনমাস হল এসেছি।

রিসার্চ করছেন?

রিসার্চ না, একটা পেপার লিখব বলে কাজ করছি। এটা শেষ করেই আমি স্টেট্‌স এ চলে যাব।

কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে পড়লাম। এলোপাথাড়ি ঘুরতে ঘুরতে স্ট্র্যান্ড-এ চলে এলাম। টেমস-এর পাড় দিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর দুজনেই বেঞ্চে বসলাম।

তন্ময় জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখানে কী করছেন?

কিছু করছি না। ভাবছি একটা চাকরি-বাকরি করব।

কোথায়? কোনো ইউনিভার্সিটিতে...

না, না, কোনো ইউনির্ভাসিটিতে নয়। কোনো অফিস-টফিসে...

আপনার কী মাথা খারাপ?

কেন?

আপনি অফিসে চাকরি করবেন?

হ্যাঁ। আমি একটু হেসে বললাম, কোনো মতে দিনটা কেটে গেলেই আমি খুশি।

তন্ময় কি যেন ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কাল আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

কেন জানি না আমি বললাম, হ্যাঁ হবে!

পরের দিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই বাড়ি ফিরে এলাম।

চৌদ্দ

পরের দিন ঠিক সময় চারিং ক্রশ-এ কালেক্টস পেঙ্গুইন বুকশপে একটু ঘোরাঘুরি করতেই তন্ময়ের দেখা পেলাম। ও বেশ কয়েকটা বই কিনেছিল। তাছাড়া একটা বড় ও ভারী ব্রীফ কেস তো ছিলই। দোকান থেকে বেরুবার সময়ই ওকে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হল। ভাবছিলাম, বইগুলো আমিই নেব কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই তন্ময় বলল, কবিতা, বইগুলো ধরবে?

হঠাৎ ও আমার নাম ধরে কথা বলতেই আমি একটু বিস্মিত হলাম কিন্তু তা প্রকাশ না করে বললাম, নিশ্চয়ই।

বইগুলো আমার হাতে তুলে দিয়েই ও রুমাল দিয়ে মুখ মুছে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বলল, বড্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি।

আমি কিছু বলার আগেই তন্ময় আবার বলল, এ দেশে লেখা-পড়া কাজকর্মের অনেক সুযোগ, কিন্তু বড্ড পরিশ্রম করতে হয়।

এবার আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমার এখনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়নি, কিন্তু দেখে শুনে তাই মনে হয়।

তন্ময় বলল, আমাদের কলকাতার অধ্যাপকরা নোটস্ লিখিয়ে লিখিয়ে এমন অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছে যে বিদেশে পড়াশুনা করতে এসে বড় কষ্ট হয়।

আমি বললাম, হতে পারে, কিন্তু আমরা তো মনে করি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার চাইতে আনন্দ আর নেই।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, তোমার মতো বান্ধবী থাকলে নিশ্চয়ই আনন্দের।

তার মানে?

তন্ময় হাসে! বলে, তুমি তো জানো না তোমাকে নিয়ে আমাদের কত আলোচনা, কত গবেষণা হতো।

আমি বিস্ময়ের হাসি হেসে প্রশ্ন করি, আমাকে নিয়ে গবেষণা?

হ্যাঁ, গবেষণা।

আমি আপনার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ও বলল, তুমি আমাকে আপনি আপনি বলছ কেন? হাজার হোক এটা লন্ডন ; তার ওপর আমরা সমসাময়িক।

অভ্যাস।

চেঞ্জ দ্যাট হ্যাবিট।

আই উইল ট্রাই।

ট্রাই ফ্রম নাউ অন।

আমি আর কিছু বলি না। শুধু হাসি।

কথা বলতে বলতে আমরা বাস স্টপে এসেছি। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়েছি। তারপর বাসে উঠেছি। বাসে পাশাপাশি বসে কথা হচ্ছে।

তন্ময় বলল, সত্যি বলছি, এমন কোনো দিন যায়নি যেদিন আমরা তোমাকে নিয়ে আলোচনা করিনি।

ওর কথা শুনে আমার মজা লাগে। জিজ্ঞাসা করি, এত আলোচনা কী ছিল?

তোমার মতো সুন্দরী ও বিদুষী মেয়েকে নিয়ে...

আমি সুন্দরী? আমি বিদুষী?

তন্ময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি সত্যি সুন্দরী।

আমি তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম।

তন্ময় আবার বলল, কাল তোমাকে দেখে আমি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম, কোনো রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসে তোমাকে নিয়ে অচিন দেশে চলে গেছে।

আমি হেসে বললাম, ইতিহাস নিয়ে গবেষণা না করে বাংলার গল্প উপন্যাস লিখলেও আপনার ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

আপনি নয়, তুমি!

আমি হাসতে হাসতেই বললাম, তুমি।

ধন্যবাদ!

যাই বল ভাই রিপোর্টার, ছাত্রজীবনের শেষে কলেজ ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে খুব ভালো লাগে। সব মানুষের কাছেই ছাত্র জীবনের স্মৃতি বড় সুখের, বড় আনন্দের। তন্ময়ের সঙ্গে আমি একই ক্লাসে পড়িনি ; কিন্তু সমসাময়িক তো। তাই বিবর্ণ বিষণ্ণ জীবনের এক শূন্য মুহূর্তে ওর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সত্যি ভালো লাগল। কিছু দিন আগে ওর সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই এত ভালো লাগত না। কিন্তু কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো মহাশূন্যে তিল তিল করে জ্বলে পুড়ে ঘুরে বেড়াবার সময় ওর দেখা পাওয়ায় আমি পরম আশীর্বাদ বলে মনে করলাম। তুমি আমার মনের অবস্থা উপলব্ধি করবে কিনা জানি না ; তবে ভাঙাচোরা নোনা ধরা বাড়িকে মেরামত করে কালার-ওয়াশ করলে যেমন ভালো লাগে, সুন্দর মনে হয়, আমিও সেই রকম বদলে গেলাম।

দেখ কবিতা, মানুষ হলেই দুঃখ পেতে হবে। এর থেকে কারুর মুক্তি নেই।

তা ঠিক, কিন্তু...

এর মধ্যে আর কোনো কিন্তু নেই। সব দুঃখকে হয়তো মানুষ ভুলতে পারে না কিন্তু তাকে জয় না করলে তো আমরা কেউ বাঁচব না।

আমি মুখ নীচু করে বলি, সবাই কী দুঃখ জয় করতে পারে?

হ্যাঁ, সবাই পারে ; কেউ দু'দিনে, কেউ দু' বছরে। স্বামী হারাবার পর, সন্তান হারাবার পর, বাবা-মা হারাবার পর ক'টা মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়?

আমি উত্তর দিতে পারি না। তন্ময় একটু হাসে। তারপর আবার বলে, তুমি তো নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে বুড়ি বিধাবারা যত বেশি দুঃখ পেয়েছে তারা সংসারের প্রতি তত বেশি আসক্ত,

তারা তত বেশি অত্যাচারী কিন্তু এত দুঃখ পাবার পর তো তাদের সন্ন্যাসিনী হওয়া উচিত ছিল।

তন্ময় ওপাশ থেকে উঠে এসে আমার পাশে বসে। আলতো করে কাঁধে হাত রাখে। তারপর বলে, এই পৃথিবীর দিকে তাকাও। দেখবে দারুণ গ্রীষ্মের পরই বর্ষা ; আবার পচা ভাদ্দরের পরই শরতের আনন্দ।

তন্ময়ের কথায় বড় যাদু। ওর স্পর্শে সারা শরীরে কি যেন একটা উন্মাদনা আনে। আমি তর্ক করতে পারি না, প্রতিবাদ করতে পারি না। ও আর একটু নিবিড় হয়। আমি বাধা দিতে পারি না। ওর হুইস্কীর গেলাসটা আমার ঠোঁটের সামনে ধরে, আমি চুমুক দিই।

ঠিক মনে নেই ; তবে বোধহয় পুরো গেলাসটাই আমি শেষ করেছিলাম। সেই কলকাতায় কাকাবাবুর কাছে একটা হুইস্কী খাবার পর এই প্রথম হুইস্কী খেয়ে বেশ লাগল। আর ভালো লাগল ওর আলিঙ্গন, নিবিড় আলিঙ্গন আর চুম্বন। আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছা করল। সন্দীপনকে হারাবার দুঃখ ভুলতে পারলাম না কিন্তু যে বেদনা বিষণ্ণতায় মন ভরে গিয়েছিল, তার থেকে মুক্তি পেলাম। তন্ময়ের সঙ্গে দিন দশ-পনেরো মেলামেশা করার পরই হঠাৎ কলকাতা থেকে খবর এলো, ডক্টর সরকারের ছোট-ভাই মারা গিয়েছেন।

খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডক্টর সরকার বললেন, জানো মা, সন্দীপন চলে যাবার পর থেকেই মনে হচ্ছিল আমার কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে।

ওঁকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমার ছিল না। শুধু বললাম, এখন তো আপনার অনেক কর্তব্য। ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝিদের মানুষ করতে হবে।

হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার কিন্তু মনে হয় আর ফিরতে পারব না।

আমার জন্য চিন্তা করবেন না। বোধহয় সামনের সপ্তাহেই আমি চাকরি পাব।

কিন্তু থাকবে কোথায়?

আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাকে বললেই ব্যবস্থা করে দেবে।

পরের দিনই প্যাকিং কোম্পানির লোকজন এসে ডক্টর সরকারের বইপত্তর ও অন্যান্য সবকিছু প্যাক করা শুরু করল। মালপত্র ওরাই জাহাজে কলকাতা পাঠাবে বলে দিন তিনেক পরেই উনি একদিন ভোরে বি-ও-এ-সি'তে কলকাতা রওনা হলেন।

ডক্টর সরকার ভিক্টোরিয়া এয়ার টার্মিনাল থেকেই চলে যেতে বললেও আমি চলে গেলাম না। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গেলাম।

উনি বললেন, মা, তোমাকে এভাবে হঠাৎ ফেলে রেখে চলে যেতে হচ্ছে বলে মনে মনে বড়ই দুশ্চিন্তা রইল। তবে তোমাকে বলে রাখছি, তোমার যে কোনো প্রয়োজনে এই বুড়ো ছেলেকে মনে করলে আমি সত্যি খুশি হব।

বেশি কথা বলার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না। শুধু বললাম, প্রয়োজনের কথা আপনাকে ছাড়া আর কাকে জানাব? আমার তো আর কেউ নেই।

ডক্টর সরকার কোনোমতে চোখের জল সম্বরণ করে বললেন, তোমার এই বুড়ো ছেলে একাই একশো। আর কাউকে কী দরকার?

হিথরো এয়ারপোর্টের অত লোকজনের ভীড়ে আমার চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল পড়ল না কিন্তু বাড়ি ফিরে আসতেই শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতার জ্বালায় আমি হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলাম।

কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা টের পাইনি। কোথা দিয়ে যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, তাও টের পেলাম না।

যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ ওই অন্ধকারের মধ্যেই চুপচাপ বসে রইলাম। খুব ক্ষিদে লেগেছিল কিন্তু তবু শুধু নিজের জন্য কিচেনে গিয়ে খাবার-দাবার তৈরি করতে ইচ্ছা করল না।

বোধহয় ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ তন্ময় এলো। আমার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়েই বলল, বুড়ো ছেলের জন্য এত মন খারাপ কোরো না। তোমার ছেলে আবার একদিন হঠাৎ এসে হাজির হবে।

ওর কথার কি জবাব দেব? মুখ নীচু করে চুপচাপ বসে রইলাম।

দু-এক মিনিট পরে তন্ময় প্রশ্ন করল, নিশ্চয়ই এয়ারপোর্ট গিয়েছিলে?

আমি মাথা নাড়লাম।

দেখে মনে হচ্ছে, সারাদিন শুধু কেঁদেছ ; খাওয়া-দাওয়া করনি।

আমি এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিই না।

তন্ময় প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে কিচেনে গেল। দুজনে মিলেই কিছু খাবার-দাবার তৈরি করলাম। খেলাম। তারপর টুকটাক এ-কথা সে-কথার পর ও জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখানে কতদিন থাকবে?

ডক্টর সরকারের কিছু কাজ আছে বলে এ মাসটা এখানেই থাকতে হবে।

একলা একলা থাকতে পারবে?

বিকেলের দিকে তুমি রোজ একবার এসো।

তা আসব, কিন্তু...তন্ময় কথাটা শেষ করে না।

আমি একটু ম্লান হেসে বললাম, অনেক কিন্তু নিয়েই আমার জীবন সুতরাং সেজন্য চিন্তা কোরো না।

তুমি বললেই কী চিন্তা না করে থাকতে পারব?

তুমি আর ক'দিনই বা এখানে আছ? দু-এক মাসের মধ্যেই তো চলে যাবে।

তন্ময় হেসে বলল, তোমাকে একলা ফেলে যাব, তা ভাবলে কী করে?

তবে কী আমিও তোমার সঙ্গে স্টেটস্-এ যাব?

দোষ কী?

এবার আমি হেসে বললাম, কলকাতা ছেড়ে লন্ডন এসেছি, এই যথেষ্ট। আর আমেরিকা গিয়ে কাজ নেই।

ভাই রিপোর্টার, তোমাকে তো আগেই বলছি, আমার জীবনে অনেক পুরুষ এসেছেন। তাদের অনেকেই আমাকে এক এক ধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন কিন্তু ওই বৃদ্ধ ডক্টর সরকার আর আমার কলকাতার ভাই ছাড়া আর কোনো পুরুষই নিঃস্বার্থ ভাবে সাহায্য করেননি। বাকি সবাই কিছু না কিছু কানাকড়ি নিয়েই আমাকে একটা খেয়াঘাট পার করে দিয়েছেন।

তুমি রাগ কর না। আমি জানি, এ পৃথিবীতে মেয়েদের চাইতে পুরুষের মহত্ত্ব অনেক বেশি। ভগবান যীশু, ভগবান বুদ্ধ থেকে শুরু করে এই পৃথিবীতে কত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। ধর্ম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাধনায় পুরুষদের চাইতে মেয়েরা অনেক পিছিয়ে কিন্তু তবু বলব, উর্বশী রম্ভা বা ক্লিওপেট্রার মতো লক্ষ কোটি পুরুষও ওই রকমই খ্যাতি অর্জন করলেও পুরুষ ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের পাতায় তাদের স্থান দেননি। শুধু নিজের অভিজ্ঞতা নয়, কলকাতা, লন্ডন, নিউইয়র্ক ও আরো অনেক শহর-নগরের বহুমেয়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

জোর করে বলতে পারি, বনের হিংস্র পশুর চাইতে বহু পুরুষই আরো ভয়ঙ্কর। ভদ্দরলোকের মুখোশ পরে যারা থাকেন তাদের হয় সাহস নেই, নয় তো সুযোগ নেই। কলকাতার বা ভারতবর্ষের বহু নিরীহ গোবেচারা ভদ্দরলোকদের যে রূপ বিদেশে দেখেছি, তাতে ভদ্দরলোক সম্পর্কে আমার আর শ্রদ্ধা ভক্তি নেই।

তন্ময়ের সাহায্য সহযোগিতার কথা সকৃতগজ্ঞ চিত্রে চিরকাল মনে রাখব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুলতে পারব না তার হিংস্র লোলুপ লালসার রুদ্রমূর্তি।

পনেরো

পরের দুটো তিনটে দিন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। নানা জায়গায় নানা জনের সঙ্গে দেখাশুনা করে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হতো। তন্ময় নিশ্চয়ই আসত কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হতো না।

সেদিন শনিবার। ক'দিনের অত্যধিক ঘোরাঘুরির জন্য অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম বলে বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিলাম। হঠাৎ খুব জোরে ডোর বেল বাজতেই উঠতে হল। দরজা খুলে দেখি তন্ময়।

তুমি এখনও ঘুমোচ্ছো?

কেন? ক'টা বাজে?

তন্ময় একটু হেসে বলল, বেশি না, সাড়ে দশটা।

আমার চোখে তখনও ঘুম। সেই ঘুম ঘুম চোখে একটু হেসে বললাম, ভাবছি, আরো একটু ঘুমোব।

ঘুমোও। কে বারণ করছে?

আমি সত্যি সত্যি আবার আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুমোলাম না কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে শুয়েই তন্ময়কে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি এর মধ্যে এসেছিলে?

রোজই এসেছি কিন্তু তোমার মতো নিঃসঙ্গ সুন্দরীর সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য হয়নি।

আমি একটু মুচকি হেসে বললাম, বেঁচে গেছ। আমার মতো ডাইনীর সঙ্গে যত কম দেখা হয় ততই ভালো।

তন্ময় চেয়ারটা আমার বিছানার খুব কাছে টেনে নিয়ে আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলল, তুমি সত্যি একটা ডাইনী। তোমার পাল্লায় পড়লে কোনো পুরুষের রেহাই নেই।

আমি আবার একটু হাসি। বলি, কি হল? এই সাত সকালে হঠাৎ এত রোমান্টিক হয়ে পড়লে কেন?

ছাত্রজীবনে যাকে দূর থেকে দেখে ধন্য হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, তার এত কাছে এসেও রোমান্টিক হব না?

এখন তুমিও ছাত্র নেই, আমিও সেদিনের মতো সুন্দরী বা যুবতী নেই। তাহলে এখন আবার রোমান্টিক হবে কেন?

তন্ময় একবার আমাকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, আমিও ছাত্র আছি। তুমিও সেদিনের মতো সর্বনাশী আছ।

আমি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আমি সর্বনাশী হলেও নিজের সর্বনাশ করেই খুশি থাকব ; অন্যের সর্বনাশ করব না।

ও আমার মুখের পরে ঝুঁকে পড়ে আমার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি কথায় কথায় এত সিরিয়াস হবে না। তুমি নিজের সর্বনাশ করতে চাইলেও আমি তা করতে দেব না।

আমি জোরে হেসে উঠে বললাম, তুমি আমার কে যে আমাকে বাধা দেবে?

তন্ময় দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে বলল, তুমি যে আমার কবিতা।

আমি আবার একটু হাসলাম। বললাম, বিদেশে একলা একলা ভালো লাগছে না বলে মোহের ঘোরে কেউটে সাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না।

আজে বাজে কথা না বলে এবার ওঠ।

কেন? বেশ তো শুয়ে আছি!

তুমি শুয়ে থাকবে আর আমি তোমার পাশে বসে থাকব, তা হয় না।

কেন?

তন্ময় হাসতে হাসতে বলল, তা আমি পারব না।

তাহলে আমিও উঠব না।

না, না, কবিতা, প্লিজ, উঠে পড়। চা খাওয়াও।

বরং আমি শুয়ে থাকি ; তুমি চা করে আনো।

সত্যি তন্ময় চা করে আনল। আমি বিছানায় বসে বসেই চা খেলাম।

চা খাওয়া শেষ হতেই ও প্রশ্ন করল, ডক্টর সরকারের কাজকর্ম শেষ করতে আর ক'দিন লাগবে?

কেন?

কেন আবার কি? চাকরি-বাকরি করবে না?

তুমি কী কোথাও কথা বলেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোথায়?

ঠিক কোথায় হবে জানি না ; তবে ডক্টর জ্যাকসন বলেছেন, আই উইল ফিক্স হার আপ সামহোয়ার।

আমি আপন মনে বললাম, একটা চাকরি হলে ভালোই হয়। সময়টা বেশ কেটে যাবে।

এ বাড়ি কবে ছাড়বে?

আগে একটা আস্তানা ঠিক করে নিই ; তারপর...

সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম, শাঁখা সিঁদুর না পরেই কি তোমার ওখানে থাকা ঠিক হবে?

তন্ময়ও হাসল। বলল, মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও এ কথা শোনার পর আর সাহসে কুলোবে না।

যাই হোক, সারাটা দিন বেশ কাটল। দুজনে মিলে ব্রেকফাস্ট তৈরি করলাম। খেলাম। গল্প করলাম। চা খেলাম। একটু কেনাকাটা করলাম। রান্না করলাম। রান্না করতে করতে দু-তিনবার চা খেলাম। লাঞ্চ খেতে খেতে বেশ বেলা হল। দুজনে পাশাপাশি বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর তন্ময় বলল, চল, সিনেমায় যাই।

বেশ বৃষ্টি পড়ছিল। তাছাড়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছিল। বললাম, না, না, এই ঠাণ্ডায় বেরুব না। তার চাইতে ঘরে বসে গল্প করে অনেক আনন্দ পাব।

গল্প করতে করতে আরো দু-একবার কফি খেলাম। তারপর তন্ময় বলল, কবিতা, চীজ্ পাকৌড়া ভাজো। আমি বরং একটা হুইস্কি কিনে আনি।

তারপর?

তারপর একটু খিচুড়ি। তারপর প্রস্থান।

কিন্তু না, সে রাত্রে তন্ময় যেতে পারল না। আমিই ওকে যেতে দিলাম না। ও যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল কিন্তু বাইরের দরজা খুলতেই আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, না না তন্ময়, এই ওয়েদারে যেও না। মারা পড়বে।

বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। তার সঙ্গে দারুণ ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস। তন্ময় বলল, এ ওয়েদারে আগে বেরুতে ভয় করত কিন্তু এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। তারপর হেসে বলল, তাছাড়া পেটে গরম খিচুড়ি ছাড়াও দু-চার পেগ হুইস্কি পড়েছে।

না, না, আজ যেও না। কাল তো রবিবার। তাছাড়া দুটো ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। শুধু শুধু কেন এই দুর্যোগের মধ্যে যাবে?

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তন্ময় আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, তাহলে যাব না?

আমি শুধু মাথা নেড়ে বললাম, না।

তন্ময় হঠাৎ দু'হাত দিয়ে আমাকে ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কাম অন, লেট আস ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্যান্স।

আমি ঘরের দিকে পা বাড়িয়েই বললাম, ডিনারের পর কেউ ড্রিঙ্ক করে না।

ও সব নিয়ম-কানুন আমার জন্য নয়।

কেন?

বাইরের দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তুমি আমাকে যেতে দিলে না কিন্তু ভিতরের দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে তো আমাকে মাতাল হতেই হবে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ভিতরে আবার কিসের দুর্যোগ?

তন্ময় একটু হেসে বলল, তোমার মতো আগ্নেয়গিরির...

সত্যি ভাই রিপোর্টার, সে রাত্রে আমরা দুজনেই ভালোবাসার নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারিনি ; হয়তো ইচ্ছাও ছিল না। শুধু এইটুকু জানি, সমস্ত দেহ বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল, মন চেয়েছিল অতীতকে নতুন ইতিহাসের পলিমাটির তলায় লুকিয়ে রাখতে। এ অস্বাভাবিক অবস্থার স্থায়িত্ব বেশিক্ষণ হয়নি। যখন আবার স্বাভাবিক হলাম তখন ঘরে-বাইরের দুর্যোগ থেমে গেছে আর লন্ডনের আকাশ সূর্যের আলোয় ভরে গেছে।

ষোল

আমার ইচ্ছায় নয়, তন্ময়ের প্রচেষ্টায় আমার জীবনে আবার মোড় ঘুরল। ডক্টর জ্যাকসন আমাকে দেখেই বললেন, মাই ডিয়ার ডটার, তুমি কালকেই অক্সফোর্ডে গিয়ে ডক্টর রবার্ট কিং-এর সঙ্গে দেখা করবে। হি ইজ লুকিং ফরোয়ার্ড টু সী ইউ অ্যান্ড টোনময়।

পরের দিনই আমি আর তন্ময় অক্সফোর্ড গেলাম। ডক্টর কিং সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা

করলেন। নিজে কফি তৈরি করে খাওয়ালেন। তারপর বললেন, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে তুমি আমার ইউনেস্কো প্রজেক্টে কাজ করতে পারো। বাট ইউ উইল হ্যাভ টু লিভ ব্রিটেন।

আমি জবাব দেবার আগেই তন্ময় বলল, স্যার, তাতে কবিতার কোনো আপত্তি নেই ; বরং ঘুরে-ফিরে কাজ করতে পারলে ও বেশি খুশি হবে।

দ্যাট্স নাইস! সিগারেটে টান দিয়ে ডক্টর কিং বললেন, আমার মনে হয় কোবিটা উইল লাইক হার ওয়ার্ক।

আম বললাম, ইউনেস্কো প্রজেক্ট কাজ করা তো পরম সৌভাগ্যের কথা এবং এই সুযোগের জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসেই ল্যান্ডলেডিকে ফোন করে জানালাম, দু'দিনের মধ্যেই বাড়ি ছাড়ছি। তারপর শাঁখা সিঁদুর না পরেই তন্ময়ের অ্যাপার্টমেন্টে উঠলাম। ওখানে থাকতে আমার আগ্রহ না থাকলেও অনিচ্ছা ছিল না। আমি জানতাম, তন্ময়ের সাহায্য দরকার। তাই কিছুটা স্বার্থপরের মতোই ওর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ওর আস্তানায় গেলাম।

আর্য ফ্যাক্টরির কয়েকটা সুটকেশ সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে লন্ডন এসেছিলাম। উঠেছিলাম বাঙালি অধ্যাপক ডক্টর সরকারের বাড়িতে, কিন্তু এবার আমাকে প্রথমেই যেতে হবে প্যারিস। তারপর আশেপাশের দেশগুলিতে। থাকতে হবে হোটেলে বা অন্য কোনো অস্থায়ী আস্তানায়। মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়ের পক্ষে বেশ চিন্তার ব্যাপার। চিন্তার আরো কারণ ছিল। লন্ডন বিদেশ হলেও সর্বত্র কলকাতার গন্ধ পাওয়া যায়। অভাব নেই ভারতীয়দের। পথেঘাটে, বাসে-টিউবে, দোকানে বাজারে সর্বত্র ভারতীয় দেখা যায়। সুতরাং নবাগত ভারতীয়কে এখানে বিপদে পড়তে হয় না, কিন্তু প্যারিস বা রোম বা ব্রুসেল্স-এ সে সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই তো তন্ময়ের সাহায্য সহযোগিতা আমার চাই-ই। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের কাছেই নিজেকে হীন মনে হল।

চুপ করে বসেছিলাম। বোধহয় বেশ কিছুক্ষণ। তাই তন্ময় ঘরে ঢুকেই বলল, তুমি এখনও ওইভাবে চুপ করে বসে আছ।

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

ও আবার জিজ্ঞাসা করল, কী এত ভাবছ?

আমি মুখ না তুলেই বললাম, তোমার কথা ভাবছি।

আমার কথা? ও বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

ও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ আমার কথা ভাবার কী কারণ ঘটল!

এবার খোলাখুলিই বললাম, এখন তোমার সাহায্য দরকার বলে ঠিক তোমার কাছে চলে এলাম। আমি জানতাম না আমি এত স্বার্থপর!

তন্ময় খুব জোরে হেসে উঠল। বলল, তুমি স্বার্থপর আর আমি মহাপুরুষ, তাই না? ও একটু এগিয়ে এসে আমার দুটো হাত ধরে বলল, কবিতা, এ সংসারে আমরা সবাই স্বার্থপর ; কেউ বেশি, কেউ কম।

আমি মুখ নীচু করেই বসে রইলাম।

দু-এক মিনিট পরে তন্ময় জিজ্ঞাসা করল, কফি খাবে?

এবার আমি বললাম, তুমি তো নিজেই রান্নাবান্না করে খাও ; যে দু-চারদিন আমি আছি,

সে ক'দিন আর তোমাকে কিছু করতে হবে না।

তারপর যদি সংসারী হতে ইচ্ছা করে?

হবে। আমার আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে?

কিন্তু তোমার সম্মতি তো চাই।

তুমি সংসারী হবে, তাতে আমার কী ভূমিকা আছে? আমি দূর থেকে শুধু শুভেচ্ছা জানাব।

কিন্তু...।

না, আর কোনো কিন্তু শুনলাম না। আমি কফি তৈরি করে আনতেই তন্ময় বলল, তোমার নিশ্চয়ই কিছু কেনাকাটা করতে হবে।

হ্যাঁ।

আমাকে কী সঙ্গে থাকতে হবে?

ও সব দেশে চাকরি করতে গেলে বা ঘোরাঘুরির জন্য কি দরকার, তা তো আমি জানি না। তাই তুমি সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।

তাহলে চল, একটু পরেই বেরিয়ে পড়ি।

রান্না করব না?

কী দরকার? বাইরেই খেয়ে নেব।

না, না, আমি রান্না করি! একটু থেমে হেসে বললাম, বাইরের খাবার তো সব সময়ই খাও। দু-চারদিন না হয় আমার রান্নাই খেলে।

অযথা কেন কষ্ট করবে?

এতে কষ্টের কী আছে? রান্না করতে আমার ভালোই লাগে।

ঠিক আছে। তাহলে খাওয়া দাওয়া করেই বেরুব।

তন্ময় ছেলেবেলায় মাকে হারালেও আদর-যত্নের অভাব হয়নি ওর জীবনে। জ্যাঠার কোনো ছেলে না থাকায় তন্ময় বড়মার কাছে মাতৃস্নেহই পেয়েছে। বোধহয় একটু বেশিই পেয়েছে। এই সামান্য কিছু দিন মেলামেশা করেই জানতে পেরেছিলাম, পাঁচ রকম ভালো মন্দ খেতে ও ভালোবাসে। তাই তো যে ক'দিন ওখানে ছিলাম আমি অনেক কিছু রান্না করতাম। ও আমাকে বলত, তুমি অনেকটা বড়মার মতো রান্না কর। তাই তো এত বেশি খেলাম।

ওর কথা শুনে আমি হাসি। বলি, তাই কী হয়? তুমি ছাড়া আর কেউই আমার রান্নার প্রশংসা করল না।

না, না, কবিতা, তুমি সত্যি খুব ভালো রাঁধতে পারো। তাছাড়া তুমি ঠিক বড়মার মতো অনেক রকম রান্না কর। তন্ময় একটু থেমে বলে, বড়মাকে হারাবার পর এমন যত্ন করে আর কেউ খাওয়ায়নি।

আমার প্যারিস যাবার প্রস্তুতি আর এই রান্নাবান্না-গল্পগুজব করেই দিনগুলো বেশ কেটে যেত। রাত বারোটা, সাড়ে বারোটার আগে শুতে যেতাম না। প্রথম দিন অনেক আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছিল। আমাকে ক্লান্ত দেখে ও দু-একবার শুতেও বলল, কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই দেরি করলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, তন্ময় নিশ্চয়ই এমন সুযোগ ছেড়ে দেবে না। এবং আমিও হয়তো ওকে বাধা দেব না, বা বাধা দিলেও ও গ্রাহ্য করবে না। যাই হোক গল্প করতে করতে অনেক রাত হল। তারপর তন্ময় আমার দুটো হাত ধরে বলল, যাও, শুতে যাও। অনেক রাত হয়েছে।

আমি বললাম, তুমি যাও। আমি একটু পরে শোব।

না, না, তুমি আগে শুতে যাও। আফটার অল তুমি আমার গেস্ট।

আমার মতো গেস্টকে অত সৌজন্য দেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে আগে শুতে যেতে পারো।

এবার তন্ময় বলল, আমি আলো অফ করে শুয়ে পড়লে তুমি তোমার ঘরে যেতে অসুবিধায় পড়বে।

আমি বুঝলাম, ও আমাকে ওর ঘরে শুতে বলবে না। একটু আশ্বস্ত হলাম ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। ভাবলাম, হয়তো মাঝরাতে আমার কাছে আসবে। হয়তো আমাকে বিরক্ত করবে—কিন্তু কী আশ্চর্য, যে ক'দিন ওর কাছে ছিলাম তন্ময় আমাকে কোনো দিন এক মুহূর্তের জন্যও বিরক্ত করল না। এত যত্নে, এত সমাদরে ও আমার দেখাশোনা করল যে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। আমি মনে মনে ওকে শ্রদ্ধা না করে পারলাম না।

তন্ময়ের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিয়েই আমি নতুন জীবন শুরু করার জন্য প্যারিস রওনা হলাম, কিন্তু এই শ্রদ্ধা দীর্ঘস্থায়ী হল না। আমি প্যারিস আসার মাস খানেক পরেই ব্রুসেল্‌স্ থেকে তন্ময়ের চিঠি পেলাম—কবিতা, আমি ব্রুসেলস্-এ এসেছি। আগামী ন' মাস এখানেই থাকব। মনে হয়, বিধাতা পুরুষ আমাকে তোমার কাছ থেকে বেশি দূরে রাখতে চান না। তাইতো অতলান্তিক পাড়ি দেবার আগে এখানে এলাম। শুক্রবার সন্ধ্যায় আসছি।

চিঠিটা পেয়ে খুশিই হলাম কিন্তু একটু দ্বিধায় পড়লাম। আমার একটাই ঘর। আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করলেও এই এক ঘরেই থাকতে হবে! তন্ময় আমার এত উপকার করেছে যে ওকে হোটেলে থাকতে দেওয়া যাবে না। মনের মধ্যে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকলেও তন্ময়কে কাছে পেয়ে ভালোই লাগল।

আমার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেই তন্ময় আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, ভাগবানের বোধহয় ইচ্ছা নয় আমি তোমার থেকে দূরে থাকি।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবানের নাম দিয়ে নিজের ইচ্ছার কথা বলছ না তো?

আমার ইচ্ছা তো তোমার এই অ্যাপার্টমেন্টেই সারা জীবন কাটিয়ে দিই।

তাই নাকি?

এ ব্যাপারে আমার মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

তোমার মনে দ্বন্দ্ব না থাকলেও আমার মনে তো থাকতে পারে।

খানিকটা স্যাম্পেন খাবার পর এ সব দ্বন্দ্ব কোথায় উড়ে চলে যাবে, তার ঠিক-ঠিকানা পাবে না।

ভাই রিপোর্টার, তুমি তো জানো পৃথিবীর অন্যান্য সব মহানগরীতে নিঃসঙ্গ জীবন কাটানো সম্ভব হলেও প্যারিসে তা কল্পনাতীত। শুধু তাই নয়, এখানে সন্ধ্যার পর দুটি ছেলে বা দুটি মেয়েকে একসঙ্গে দেখাও যায় না। অনেকের কাছেই তা বিস্ময়ের। এবং কৌতূহলের।

শুধু তাই নয়, দু' চার সপ্তাহ প্যারিস বাস করেই বুঝতে পেরেছিলাম, কোনো সময়ের পক্ষেই একা থাকা নিরাপদ নয়! তাইতো মনের মধ্যে যত দ্বন্দ্ব, যত ভয়ই থাকুক, উন্মত্ত নারীলোভী অপরিচিত পুরুষদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তন্ময়কে কাছে পেয়ে খুশিতে ভরে গেলাম।

ওকে কফি খেতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বল, কী খাবে?

ও কফির পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, আসতে না আসতেই খাবার কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

ন'টা বাজে। তাই ভাবছিলাম রান্না সেরেই গল্পগুজব করব।

ও হো হো করে হেসে উঠল। বলল, আজ শুক্রবার। কাল-পরশু ছুটি। আজকের এই সন্ধ্যায় কেউ বাড়িতে বসে থাকে?

তা জানি কিন্তু তুমি ক্লান্ত হয়ে এসেছ বলেই ভাবছিলাম আজ আর বেরুব না।

ও আমার কোনো কথা শুনল না। আমাকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শুধু তন্ময়কে দোষ দেব না। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভুলে গেলাম আমরা বাঙালি, ভারতীয়। ভুলে গেলাম আমরা অবিবাহিত। আনন্দে উন্মত্ত হয়ে আমরা প্রায় নাচতে নাচতে ঘুরে বেড়ালাম। যত্র-তত্র-সর্বত্র। সাইড ওয়াক কাফেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক বোতল ওয়াইন খেয়ে দুজনেই বেশ মদীর হয়ে উঠলাম। তারপর তন্ময় বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সবার সামনে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। তারপর আরো ঘুরলাম, আরো ওয়াইন খেলাম। নাচ দেখলাম। তিন-চারটে কাফে থেকে কিছু কিছু খেয়ে ডিনারের পর্ব শেষ করলাম।

বোধহয় রাত দুটো-আড়াইটের সময় অ্যাপার্টমেন্টে ফিরলাম। তারপরের কথা আর লিখব না। শুধু জেনে রাখ, পরের দিন অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, তখন চোখের সামনে দুটি উলঙ্গ নারী-পুরুষের পেন্টিং দেখে বিস্মিত হলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই আমার বিস্ময় কেটে গেল। বুঝলাম, ওটা কোনো শিল্পীর সৃষ্টি নয় ; সামনের আয়নায় আমার আর তন্ময়ের প্রতিচ্ছবি!

আজ এখানেই শেষ করছি।

সতেরো

তন্ময় তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। আমিও কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলাম। নানা কথা ভাবলাম। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তন্ময় আমাকে এমন করে জড়িয়ে ছিল যে আমি পাশ ফিরতে পারলাম না। তবু মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখলাম। দেখতে ইচ্ছা করল। ভেবেছিলাম, ওকে দেখেই রাগ হবে, ঘৃণা হবে কিন্তু রাগও হল না, ঘৃণা করতেও পারলাম না। আমার মায়া হল। তারপর হঠাৎ মনে হল, আমার একটা সন্তান হলে বেশ ভালো হতো। মনে হল, যে হয়তো এইভাবেই আমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকত ; হয়তো আমি পাশ ফেরবার চেষ্টা করলে ঘুমের ঘোরে ও আমাকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরত। মনে হল আরো কত কী! তারপর একবার ক্ষণিকের জন্য মনে হল, তন্ময় যদি হঠাৎ শিশু হয়ে যায় অথবা ঠিক ওর মতো একটা শিশু যদি আমার সন্তান হত, তাহলে বেশ হতো।

মাথার দিকের জানালা দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক রোদ্দুর আমার মুখের ওপর পড়তেই আমার স্বপ্ন দেখা শেষ হল। তন্ময়ের ঘুম না ভাঙিয়ে অতি কষ্টে উঠে পড়লাম। দেখি, ঘরের মেঝের কার্পেটের ওপর আমাদের দুজনের জামা কাপড় ব্যাগ-পার্স ইত্যাদি চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। একটু হাসলাম। ভাবলাম, কাল রাত্রে কী দুজনেই একসঙ্গে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম?

তন্ময়ের গায়ে একটা চাদর দিয়ে আমি বাথরুমে গেলাম। আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে

এসে দেখি ও তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বুঝলাম, কাল রাত্তিরে একটু বেশিই ড্রিঙ্ক করেছিল। তারপর অত রাত্তিরে ফিরে এসে আমাকে নিয়ে কতক্ষণ পাগলামি করেছে, তার ঠিক নেই। তাই ভাবলাম, ওকে ডাকব না।

আমি নিজের জন্য এক কাপ চা করেই রান্নাবান্নার উদ্যোগ শুরু করলাম। তারপর একটু হাত খালি হতেই ঘরদোর ঠিক করতে এলাম। তন্ময়ের জামা-কাপড় তুলতে গিয়েই দেখি পার্সের ভিতর থেকে কিছু কাগজপত্র বাইরে পড়ে রয়েছে। ওই কাগজপত্র তুলতে গিয়েই চমকে উঠলাম। তন্ময়ের ওপর রাগে-ঘেন্নায় আমার সারা মন প্রাণ বিদ্রোহ করে উঠল। একবার মনে হল, হাতের কাছে একটা চাবুক থাকলে আশা মিটিয়ে মারতাম। অথবা...

না, আমি ওর সামনে দাঁড়াতে পারলাম না। একবার মনে হল, ঘরের দরজা লক করে বেরিয়ে পড়ি। আবার মনে হল, না, না, আমি কেন পালাব। এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতেই কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলাম। তারপর চুপ করে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ পিছন থেকে এসে তন্ময় আমাকে জড়িয়ে ধরতেই আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, সারারাত উপভোগ করেও মন ভরেনি?

তন্ময় আমার কাঁধের ওপর মুখ রেখে বলল, সারারাত কেন, সারা জীবন ধরে তোমাকে উপভোগ করলেও আশা মিটবে না।

সত্যি বলছ?

ও আমার বুকের ওপর একটা হাত রেখে বলল, সত্যি বলছি।

বুকের মধ্যে জ্বলে গেলেও জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমাকে খুব আদর করবে?

তন্ময় একটু হেসে বলল, এ কথা আবার জানতে চাইছ? বলেই ও আমাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েই চুমু খেল ওষ্ঠে, মুখে, গলায়। বারবার, বহুবার।

তোমাকে দেখে তো মনে হয়নি তুমি কোনো দিন এভাবে চাইতে পারো।

আমি একটু মুচকি হেসে বললাম, মানুষকে দেখে কতটুকু জানা যায়?

ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তো নিশ্চয়ই জানা যায়।

জানি না।

জানি না বলছ কেন? আমি যেমন তোমাকে চিনেছি, জেনেছি, সেই রকম তুমিও তো আমাকে চিনেছ, জেনেছ।

আমি একটু হেসে বললাম, তোমরা বল, পুরুষস্য ভাগ্যম স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম মানুষ তো দূরের কথা, দেবতারাও জানেন না কিন্তু আমি যদি পারতাম তাহলে এই শ্লোকটা পালটে দিতাম।

কেন?

বলতাম শুধু মেয়ে না পুরুষের চরিত্রও সত্যি অবোধ্য।

হঠাৎ, এ কথা বলছ কেন?

না, এমনি মনে হল বলে বলছি।

সবাইকে না জানলেও আমাকে তো জেনেছ।

নিশ্চয়ই কিছু জেনেছি।

যা জেনেছ তাতে কী তুমি খুশি?

আবার আমি হাসি। বলি, যা জেনেছি, যা পেয়েছি, তাতে কোন মেয়ে খুশি হবে না?

একটু চুপ করে থাকার পর তন্ময় জিজ্ঞাসা করল, চা খেয়েছ?

সরি! এখুনি তোমাকে চা দিচ্ছি।

চা এনে দিতেই তন্ময় হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, আজকেও তোমাকে কালকের মতো পাবো তো?

ঠিক কালকের মতো কি আজ হতে পারে? কাল কালই ফুরিয়ে গেছে ; ঠিক কালকের মতো দিন তো কখনই ফিরতে পারে না।

এ কথা বলছ কেন? কাল কী তোমার ভালো লাগেনি?

কাল যখন তোমার সঙ্গে সমান তালে ঘুরেছি-ফিরেছি হেসেছি খেলেছি তখন নিশ্চয়ই ভালো লেগেছিল কিন্তু...

আমি কথাটা শেষ করি না। হঠাৎ থেমে যাই। মুখ নীচু করে বসে থাকি।

তন্ময় আমার মুখখানা আল্‌তো করে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু বলেই থামলে কেন?

এমনি।

আমি আবার মুখ নীচু করেই বসে রইলাম, কিন্তু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মনের মধ্যে যে আনন্দ-উত্তেজনা, যে স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠছিল তা হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ায় সত্যি কান্না পাচ্ছিল। আমি জীবনে একজনকেই মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি। তাকে হারাবার পর আর কাউকে ভালোবাসতে না চাইলেও তন্ময়কে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছিল। এই ভালো লাগা টিকে থাকলে হয়তো অতীতের দুঃখ ভুলে নতুন করে ভালো ভাবে বাঁচার কথা ভাবতাম। ভাবতাম কেন, বোধহয় মনে মনে ভাবতে শুরু করেছিলাম। আমার ও কথা হয়তো শুনতে তোমার খারাপ লাগছে, কিন্তু ভাই, কোনো দুঃখই তো মানুষ চিরকাল মনে রাখে না। মনের বেলাভূমিতে নিত্য-নতুন পলিমাটি জমতে জমতে অতীতের দুঃখ কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

মনে মনে এলোপাথাড়ি হাজার রকমের চিন্তা করছিলাম। তন্ময়ও বিশেষ কথাবার্তা বলল না। বাথরুমে গেল। ফিরে এসেই বলল, কবিতা, দারুণ খিদে পেয়েছে। খেতে দেবে?

হ্যাঁ দিচ্ছি।

খাবার সময়ও বিশেষ কথাবার্তা হল না। ও একবার শুধু জিজ্ঞাসা করল, খেয়ে উঠেই বেরুবে?

আমি বললাম, না।

কেন?

টায়ার্ড। ঘুমোব।

খেয়ে উঠেই আমি শুয়ে পড়লাম। তন্ময়ও কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর আমার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। আমি পাশ ফিরে শুয়েছিলাম। ও আমাকে জড়িয়ে ধরতেই বললাম, ঘুমোতে দাও।

কথাও বলবে না?

এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া এ রকম ভাবে জড়িয়ে থাকলে আমার ঘুমও আসবে না।

কাল রাত্রে ঘুমোলে কী করে?

কাল রাত্রে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ছিলাম না।

তন্ময় একটু হেসে বলল, যা-ই হোক কাল খুব এনজয় করেছি। সত্যি কবিতা, জীবনে এত আনন্দ কোনো দিন পাইনি।

আমার মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠলেও তন্ময় দেখতে পেল না। বললাম, সত্যি?

এই আনন্দ আর কোথায় পাবো?

এ প্রশ্নের জবাব কী আমার কাছে চাও?

তন্ময় হঠাৎ এক টানে আমাকে ওর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার কি হয়েছে?

কিছু না।

কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই দেখছি তুমি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে রয়েছ।

আমি হেসে বললাম, ঘুমোতে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙতেই দেখি তন্ময় বিয়ার খাচ্ছে। আমাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখেই ও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, আর ইউ রেডি ফর ইভনিং প্রোগ্রাম?

মুহূর্তের মধ্যে মনে নানা চিন্তা এলো, গেল। তারপর মনে মনে ভাবলাম, স্বাভাবিক অবস্থায় নিশ্চয়ই সব কথা বলতে পারব না। সুতরাং...

হাসতে হাসতে বললাম, টয়লেট থেকে এসেই তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

আমার কথা তন্ময় শুনেই খুশিতে লাফ দিয়ে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, দশ মিনিট ধৈর্য ধর।

তারপর আমি একটু তৈরি হয়েই এক বোতল হুইস্কি বের করলাম।

তন্ময় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হুইস্কি বের করছ কেন? বিয়ার খাবে না?

বিয়ার খেয়ে কী নেশা হয়? ওতে শুধু আমেজ আসে।

কিন্তু...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি হুইস্কির বোতল খুললাম। গেলাসে ঢাললাম। তারপর দু-চারটে আইস-কিউব দিয়েই গেলাস তুলে ধরে বললাম, চিয়ার্স।

তন্ময় কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ বিয়ারের জাগটা তুলে ধরে বলল, চিয়ার্স!

দু-তিন রাউন্ড হুইস্কি খাবার পরই আমি তন্ময়কে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে তোমার ভালো লাগে?

তন্ময় হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, তোমাকে ভালো লাগবে না এমন পুরুষ মানুষ আছে?

আর কাউকে আমার মতো ভালো লাগে না তো?

তুমি পাগল হয়েছ?

আমি দু' হাত দিয়ে তন্ময়ের মুখখানা জড়িয়ে ধরে বললাম, না, না, আমি পাগল হইনি। তুমি বল আর কাউকে আমার মতো ভালো লাগে কিনা।

এমন করে ভালো লাগার মতো মেয়ে কী আর কেউ আছে?

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ঠাস করে ওর গালে একটা একটা চড় মেরে বললাম, শিখাকেও আমার মতো ভালো লাগে না?

আমার কথা শুনেই তন্ময় মুহূর্তের মধ্যে বোবা হয়ে গেল। পাথরের মতো স্থির হয়ে রইল। আমি জোর করে ওকে চেপে ধরে বললাম, আমাকে তোমার বিয়ে করতেই হবে। হিয়ার অ্যান্ড নাউ। বিয়ে না করলে আমি তোমাকে এখান থেকে যেতে দিচ্ছি না।

জানো রিপোর্টার, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আরো অনেক কথা ওকে বলেছিলাম কিন্তু সব কথা আজ আর মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে বেশ কিছুক্ষণ বকাবকি করার পর ও বলেছিল, আমাকে বিয়ে করে তোমার লাভ নেই।

লাভ-লোকসানের কথা বাদ দাও। আমাকে তোমার বিয়ে করতেই হবে।

তন্ময় মুখ নীচু করে বলল, আমাকে বিয়ে করলে তো তুমি কোনোদিনই সন্তানের মা হতে পারবে না।

আমি উন্মাদের মতো চিৎকার করে বললাম, তাই বুঝি কলকাতায় বিয়ে করা বৌ রেখে এসে লন্ডনে শিখাকে নিয়ে ফুর্তি করতে?...শিখাকে মাতাল করে তার নেকেড ছবি তুলেছ কেন? ওকে ব্ল্যাক মেলিং করবে?

তন্ময় চুপ।

আমাকে উলঙ্গ করে আমার ছবি তুলবে না? কাম অন! হ্যাভ মাই নেকেড ফটোগ্রাফ!

তন্ময় তখনো চুপ।

আমি এক লাথি মেরে হুইস্কির বোতলটা ফেলে দিয়ে বললাম, এনাফ ইজ এনাফ! নাউ গেট্ আউট মাই বয়। বেরিয়ে যাও ; এখুনি বেরিয়ে যাও।

সত্যি বলছি ভাই, সেদিন তন্ময়কে তাড়িয়ে দেবার পর আর কোনোদিন ওর কথা আমি মনেও করিনি।

আঠারো

বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রীয় সংস্থা ইউনেস্কোতে বছর তিনেক ছিলাম। নানা কাজে সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীদের সমাগম হয় ইউনেস্কো হেড কোয়ার্টার্সে। কখনও কাজে, কখনও ককটেল-ডিনার রিসেপশনে তাদের অনেকের সঙ্গেই আমার দেখা হতো। আলাপ হতো। কখনও কখনও এদের সঙ্গে ঘুরতে হতো বিভিন্ন দেশে।

ওই তিন বছরে এমন অনেককে কাছে পেয়েছি যাদেব সান্নিধ্য-লাভে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। এদের কাছে কত কথা শুনেছি, কত কথা জেনেছি। আমি বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি এদের পাণ্ডিত্য ও মহানুভবতা দেখে।

তন্ময় আমাকে অনেক দুঃখ, ব্যথা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মনে মনে আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ? কারণ ওরই আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় আমি ডক্টর রবার্ট কিং-এর সান্নিধ্যে আসি এবং আমার জীবনে এক অনন্য অধ্যায়ের সূচনা হয়। আজ যে আমি ইউনাইটেড নেশনস্ এ আছি, তার পিছনেও তো ওদেরই অবদান।

একদিন রাগ করেই কাকুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সুপর্ণা-অমিয়র আস্তানায় উঠি। কিন্তু আজ যখন নিজের অতীতের কথা ভাবি, ভালো মন্দের হিসাব দেখতে বসি, তখন মনে হয়, আমার জীবনে ওই চরিত্রহীন কাকুর অবদানও কম নয়। হাজার হোক, পিতৃ-মাতৃহীন তোমার এই দিদি তারই স্নেহচ্ছায়ায় উচ্চ শিক্ষালাভ করে। আমি লেখাপড়ায় নেহাত খারাপ ছিলাম না কিন্তু পড়াশুনার জন্য খুব বেশি পরিশ্রম করতে একটুও ভালো লাগত না। বিশেষ করে বাবা-মাকে হারাবার পর এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমি সত্যি সত্যি লেখাপড়া ছেড়ে দেবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু না, তা হয়নি ; হতে পারেনি শুধু ওই মানুষটার জন্য। যখন রিসার্চ করছি, তখন মাঝে মাঝেই মনে হতো, কী হবে রিসার্চ করে? ডক্টরেট হব? অধ্যাপনা করব? না, না, পোষা ময়না পাখির মতো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই কথা ছাত্রছাত্রীদের বলতে পারব না।...

পর পর তিন-চারদিন শুধু গল্প-উপন্যাস পড়ছিলাম আর বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখছিলাম। প্রথম ক'দিন কাকু কিচ্ছু বললেন না। তারপর একদিন ইভনিং শো'তে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরতেই কাকু হাসতে হাসতে বললেন, আই ফিল হ্যাপি টু' সী ইউ এনজয়িং।

আমি একটু হেসে বললাম, থ্যাঙ্কস।

মাঝে মাঝে এই রকম আনন্দ করা খুব ভালো।

আমি তো ভাবছি এইভাবে আনন্দ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেব।

শুধু আনন্দ করেই কাটিয়ে দেবে?

হ্যাঁ।

পারবে?

না পারার কি আছে?

কাকু মাথা নেড়ে বললেন, না কবিতা, পারবে না। কোনো মানুষই শুধু আনন্দ করে জীবন কাটাতে পারে না। কম-বেশি কিছু কাজ কর্ম দায়িত্ব পালন না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। তুমিও পারবে না।

আমি তর্ক না করে চুপ করে রইলাম।

পরে, রাত্রে শোবার পর কাকু বললেন, সবাই লেখাপড়া করে না। সম্ভবও না। তোমার বাবা-মা বেঁচে থাকলে কেউ কিছু বলতে পারত না, কিন্তু এখন তুমি লেখাপড়া বন্ধ করলে সবাই আমাকে দোষারোপ করবে। সবাই মনে করবে, লেখাপড়ার ব্যাপারে আমার কোনো উৎসাহ নেই বলেই তোমার লেখাপড়া হল না।

তাই কী?

হ্যাঁ কবিতা, সবাই তাই ভাববে। তাছাড়া তুমি লেখাপড়া না করলে আমি নিজেও মনে মনে অপরাধী হয়ে রইব।

আমি চুপ করে থাকি।

কাকু আবার বলেন, তুমি এম. এ. পাশ করলে, ডক্টরেট হলে আমিও সবাইকে গর্ব করে বলতে পারতাম...।

বিশ্বাস কর ভাই, কাকু কত রাত্রি না ঘুমিয়েও আমার নোট্স টুকে দিয়েছেন। রিসার্চ করার সময় যে বই আমি কোথাও খুঁজে পেতাম না, সে বই কাকুই জোগাড় করে এনে দিতেন। শুধু কী তাই? কাকু নিজে টাইপরাইটারে টাইপ করে দিয়েছিলেন আমার থিসিস। অত্যন্ত পরিশ্রমের ও একঘেয়ে কাজ। আমি বার বার বারণ করেছিলাম কিন্তু না, উনি কিছুতেই শুনলেন না।

দু'হাত দিয়ে হুইস্কীর গেলাসটা ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে কাকু বললেন, আমি জানি কবিতা, তুমি কিছু টাকা খরচ করলেই থিসিসটা ছাপিয়ে দিতে পারো কিন্তু তোমার থিসিস আমি নিজে টাইপ করলে আমি যে আত্মতৃপ্তি পাব যে আনন্দ পাব...

কিন্তু কাকু বড্ড পরিশ্রমের কাজ।

হোক। এবার কাকু এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে আমার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বলেন, একদিন হয়তো তুমি অনেক দূরে চলে যাবে। হয়তো আমার সঙ্গে তোমার সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু আর কোনো কারণে না হোক, অন্তত এই থিসিস টাইপ করার জন্য তুমি আমাকে ভুলবে না।

সেদিন আমি কাকুর কথার প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, আপনি থিসিস টাইপ না করলেও

আমি কোনোদিন আপনাকে ভুলব না।

কাকু একটু হেসে বললেন, ও কথা বোলো না কবিতা। অনেক প্রিয়জনকেই মানুষ ভুলে যায়। তুমি যে একদিন আমাকে ভুলে যাবে না এ কথা জোর করে বলা যায় না।

সেদিন কাকুর সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ তর্ক করেছিলাম কিন্তু এতদিন পরে আজ আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, কাকু ঠিকই বলেছিলেন।

কাকু আমার বাবার বন্ধু হলেও বয়স ও মানসিক দৃষ্টি-ভঙ্গির দিক থেকে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে কোনো সংশয় হয়নি। তারপর ওর ফ্ল্যাটে থাকার সময় আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। আমার সঙ্গে ওর দৈহিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কাকুকে কোনোদিনই চরিত্রহীন মনে করিনি। রমলাকে দেখার পরই মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেলাম। হঠাৎ একটা ঘটনাবহুল অধ্যায়ের যবনিকা টেনে আমি সুপর্ণার কাছে চলে গেলাম।

কাকুর কথা, আমার পুরনো দিনের কথা আজকাল আমি মনে করি না। বোধহয় মনে করতে চাই না। প্রয়োজনও অনুভব করি না। তোমাকে চিঠি লিখতে গিয়ে আমার পুরনো দিনের অনেক কথাই নতুন করে মনে পড়ছে। আজ তোমার কাছে স্বীকার করছি, ইদানীং কালে মাঝে মাঝেই আমার কাকুর কথা মনে হয়। জানি না তিনি কোথায়। তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না। বেঁচে থাকলেও হয়তো সুস্থ নেই। হয়তো সালাউদ্দিন কাকুর ওখানে কাজ করছে না। তার কোনো খবরই জানি না। তাই তো হাজার রকমের খারাপ চিন্তা মনের মধ্যে ভীড় করে। কাকু ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছেন কী? উনি অর্থনৈতিক কষ্ট পাচ্ছেন না তো?

যে মানুষটাকে একদিন অসহ্য মনে হয়েছিল, যাকে অসম্ভব ঘৃণা করেছি, এখন মাঝে মাঝে সারারাত তারই কথা ভাবি। না ভেবে পারি না। মাঝে মাঝেই ওকে দেখতে খুব ইচ্ছা করে। এখন বোধহয় কাকুকে আর ঘৃণা করি না।

বলতে পারো ভাই, কেন এমন হয়? তাই তো বলছি, যারাই আমার কাছে এসেছেন, তারাই আমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছেন, কিছু দিয়েছেন। এই পৃথিবীতে অমিয়র মতো পুরুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য না করলেও এই সংসারের চোদ্দ আনা মানুষই ব্যবসাদার। সবাই লেনদেন চায়।

অমিয় স্বতন্ত্র নয়, অনন্য, অসাধারণ। ওদের কথা আলাদা। অমিয়কে শুধু ভালোবাসিনি, শ্রদ্ধাও করি। ইউনেস্কোর আজিজুল ইসলাম ওই ধরনের।

ইন্ডিয়ান এম্বাসির কালচারাল কাউন্সিলার মিঃ গিদওয়ানীর বাড়ির এক পার্টিতে আমার সঙ্গে আজিজুলের প্রথম আলাপ। সেইদিনই বুঝেছিলাম, এই ঢাকাই বাঙাল সত্যি অনন্য। আর দশজনের মধ্যেও ওকে চিনতে কষ্ট হয় না।

গিদওয়ানী আমাদের আলাপ করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ও আমাকে বলল, আপা, তুমি আমাকে আজিজ বলেই ডাকবে।

আপা মানে?

দিদি! দিদি! আজিজ হেসে বলল, জানো আপা, ইউরোপ আমেরিকা অনেকদিক থেকে এগিয়ে আছে কিন্তু হালাগো সমাজে আপাও নাই, ভাবীও নাই।

আমি বলি, ঠিক বলেছ।

আজিজ এবার একটু গম্ভীর হয়েই বলে, হতভাগারা গার্লফেন্ড নিয়ে বড্ড বেশি নাচানাচি করে কিন্তু দিদি বা বৌদির চাইতে ভালো গার্ল ফ্রেন্ড কী হতে পারে?

আমি চুপ করে থাকি।

ও আবার বলে, এ ছাড়া শালী বা দেওর যে কী অদ্ভুত জিনিস তাও শালারা বুঝল না।

আমার মতো আজিজও একটা ইউনেস্কো প্রজেক্ট কাজ করত। বছর দুই শুধু আজিজ ছাড়া আর কোনো পুরুষকে আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে দিইনি।

তন্ময়ের জন্য সমস্ত পুরুষকেই আমি ঘেন্না করতে শুরু করেছিলাম কিন্তু আজিজকে পেয়ে বুঝলাম, না, এই পৃথিবীর সব পুরুষই কামনা-বাসনার আগুনে জ্বলে না।

আজ আর লিখছি না। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। দু-চারদিন পরেই আবার চিঠি দিচ্ছি। তোমাদের দুজনের চিঠি আজই পেলাম।

উনিশ

আজিজুল প্যারিস ছেড়ে যাবার মাস দেড়েক পরে হঠাৎ অফিস থেকে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেই ডক্টর সরকারের চিঠি পেলাম।...

মা, আমি তোমার নেহাতই অপদার্থ সন্তান। তাই তো আজকাল তোমাকে বিশেষ চিঠিপত্রই লিখি না। তোমার চিঠি যে খুব নিয়মিত পাই, তা নয় কিন্তু তবুও তুমি সময় পেলেই আমাকে চিঠি লেখ। তাছাড়া কিছুদিন আগে আজিজুল নামে একটি ছেলে তোমার পাঠানো দুটি শার্ট, দুটি টাই আর কয়েক প্যাকেট ব্লেড দিয়ে গেল। ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝলাম, ও তোমার বিশেষ গুণগ্রাহী ও ভক্ত। ভেবেছিলাম, জিনিসগুলো পাবার প্রাপ্তি সংবাদ পাঠাবে, কিন্তু তা আর হল না। সপ্তাহখানেকের জ্বরে শরীর এমন কাহিল হল যে বহুদিন কোনো কাজকর্মই করিনি। অমিয় আর সুপর্ণা মাঝে মাঝেই আমাকে দেখতে আসে। মনে হয় জিনিসগুলির প্রাপ্তি সংবাদ ওদের চিঠিতেই জেনেছ।

এবার একটু কাজের কথায় আসি। আমার অধ্যাপনা জীবনের প্রথম ব্যাচের ছাত্র নবেন্দু এখন শিক্ষাজগতের একটি ধ্রুবতারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ামণি। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি স্বদেশে এবং বিদেশে। কতবার যে বিদেশ গেছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। যাতায়াতের পথে প্যারিসে থেকেছে দু-একদিন কিন্তু এর বেশি নয়। এবার নবেন্দুকে প্যারিসেই থাকতে হবে তিন মাস। ওখানকার কর্তৃপক্ষই ওর সব ব্যবস্থা করবেন। তোমাকে দুটি অনুরোধ। আমার পরামর্শ মতো নবেন্দু শনিবার (৭ই সেপ্টেম্বর) সকাল দশটায় এয়ার ফ্রান্স-এর ফ্লাইটে ওরলি এয়ারপোর্টে পৌঁছবে। সেদিন তো তোমার ছুটি। তাই তুমি যদি এয়ারপোর্ট থেকে ওকে তোমার ওখানে একদিনের জন্য নিয়ে যাও, তাহলে খুব ভালো হয়। রবিবার বিকেলের দিকে ওর নির্দিষ্ট আস্তানায় চলে যেতে একটু সাহায্য করবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবেন্দু ভোজনরসিক এবং আমাদের নিজস্ব খাবার ছাড়া অন্য কোনো দেশের কোনো খাবার খেয়েই নাকি ওর পেট ভরে না। তাই শনিবার-রবিবার তোমার অন্য কোনো প্রোগ্রাম না থাকলে ওকে মাঝে মাঝে তোমার ওখানে আসতে বল। নবেন্দু মহাপণ্ডিত লোক। মনে হয় ওর সান্নিধ্যে তোমার ভালোই লাগবে।...

পূজা আসছে। তাই নবেন্দুর সঙ্গে তোমার জন্য একটা শাড়ি পাঠাচ্ছি। এ ছাড়া চিড়ে-মুড়ি-বড়ি ইত্যাদি ধরনের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও দু-তিনটে পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা পাঠাব...

৭ই সেপ্টেম্বর সকালে গাড়ি নিয়ে ছুটলাম ওরলি এয়ারপোর্টে। ঠিক সময়েই প্লেন এলো। শাড়ি পরা আর কোনো মেয়ে ছিল না বলে আমাকে চিনতে নবেন্দুবাবুর একটুও কষ্ট হল না।...আই হোপ তুমিই কবিতা?

হেসে বললাম, হ্যাঁ।

তোমাকে অনেক কষ্ট করে আসতে হল।

না, না, কষ্ট কিছু না ; বরং মাঝে মাঝে নিজের দেশের মানুষকে কাছে পেলে ভালোই লাগে।

তা ঠিক কিন্তু...

ডক্টর সরকার যখন বলেছেন তখন দ্বিধা করার কোনো কারণ নেই।

যাই হোক মালপত্র পিছনের সীটে বোঝাই করে ওকে সামনের দিকের ডানদিকে বসালাম। গাড়ি স্টার্ট দিলাম। ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, ফোর্থ গিয়ার। প্রায় একশো কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছি। হঠাৎ নবেন্দুবাবু বললেন, তুমি তো দারুণ জোরে গাড়ি চালাও।

হেসে বললাম, এখানে চালাতেই হয়।

তা ঠিক। তবে লেফট্-হ্যান্ড ড্রাইভ গাড়ি চালাতে অসুবিধে হয় না?

আমি তো কলকাতায় গাড়ি চালাতাম না ; তাই কোনো অসুবিধে হয় না।

তুমি বোধহয় অনেক দিন দেশে যাও না..

হ্যাঁ, দেশ ছাড়ার পর আর যাইনি।

যেতে ইচ্ছে করে না?

ইচ্ছে করে ঠিকই কিন্তু ঠিক নিজের কেউ নেই বলে আর এত খরচ করে যেতে মন চায় না।

ছুটিতে কোথাও যাও না?

গতবার এথেন্সে গিয়েছিলাম। এবার কোথায় যাব ঠিক করিনি।

কবে ছুটি পাবে?

ফার্স্ট অক্টোবর থেকেই আমার ছুটি।

আমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেই নবেন্দুবাবু বললেন, অপূর্ব সাজিয়েছ তো।

আমি একটু হেসে বললাম, স্বামী-পুত্রের ঝামেলা তো নেই। তাই অফিস থেকে ফিরে এসে ঘর গুছিয়েই সময় কাটিয়ে দিই।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে কফি করতে গেলাম। কফি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই নবেন্দুবাবু দুটো প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, ডক্টর সরকার পাঠিয়েছেন বুঝি?

একটা উনি পাঠিয়েছেন, অন্যটা অমিয়।

খুলে দেখি, ওরা দুজনেই দুটি সুন্দর সিল্কের শাড়ি পাঠিয়েছেন। এছাড়াও আরো অনেক কিছু। এবার উনি দু'তিনটে শারদীয় সংখ্যা এগিয়ে দিতেই বললাম, এগুলো দেখলেই কলকাতার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

সত্যি, এই শারদীয় সংখ্যা নিয়ে সারা বাংলাদেশে যে চাঞ্চল্য দেখা যায়, তেমন আর কোথাও হয় না।

কফি খেতে খেতেই বলি, বিদেশে এসে অনেক কিছু পেয়েছি, কিন্তু কলকাতা ছাড়ার জন্য অনেক কিছু হারাতেও হয়েছে।

এবার উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আর কত কাল বিদেশে থাকবে?

আমার কাছে দেশ-বিদেশ দুইই সমান।

ও কথা বোলো না কবিতা। হাজার হোক নিজের দেশ, নিজের পরিবেশ, নিজের ভাষা, বন্ধুবান্ধবের আকর্ষণ তো আলাদা।

তা ঠিক কিন্তু ওখানে আমার মতো মেয়ের পক্ষে একলা থাকা খুবই কঠিন।

যদি কলকাতায় থাকতে না চাও তাহলে দিল্লি বা বোম্বেতে থাকো।

এবার একটু হেসে বললাম, দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হয়?

নবেন্দুবাবুকে দেখেই বোঝা যায়, উনি বোদ্ধা। চোখে-মুখে একটা ঔজ্জ্বল্য। বয়স পঞ্চাশের ঘরে হলেও সারা চেহারায় যৌবনের দীপ্তি। কথাবার্তায় অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন। মনে মনে বললাম, ডক্টর সরকার ঠিকই লিখেছেন।

কফি খাওয়া শেষ হলে উনি সুটকেশ থেকে একটা শাড়ি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, দিস ইজ-এ টোকন প্রেজেনটেশন ফ্রম ইওর নিউ ফ্রেন্ড!

অত্যন্ত দামি কাঞ্চিপুরম সিল্কের শাড়ি দেখেই বললাম, এত দামি শাড়ি আনার কি দরকার ছিল?

নবেন্দুবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, তুমি পরলে কোনো শাড়িকেই দামি মনে হবে না। তোমার রূপ-গুণের কাছে আর সবকিছু ম্রিয়মান হয়ে যায়।

কথাটা শুনেই একটু বেসুরো মনে হল কিন্তু উনি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, ডক্টর সরকার যাকে মা বলেন সে তো সাধারণ মেয়ে হতে পারে না।

হেসে বললাম, সত্যি আমি অসাধারণ?

নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট!

আমার আগের অ্যাপার্টমেন্টের চাইতে এটা একটু বড় হলেও শোবার ঘর একটাই। এই ঘরেই আমার সবকিছু। অন্য ঘরের একদিকে ছোট্ট একটা খাবার টেবিল। টেবিলের দু'দিকে দুটো চেয়ার। অন্যদিকে বসার ব্যবস্থা। ছোট্ট একটা প্যান্ট্রি। ছোট্ট একটা বাথ-কাম-টয়লেট। কোনোমতে স্নানাদি সারা যায় কিন্তু কোনোমতেই কাপড়-চোপড় বদলানো যায় না। তাছাড়া বাথরুম হচ্ছে প্যান্ট্রির পাশে। কাপড়-চোপড় পরার জন্য আমাকে ড্রইংরুম পার হয়ে শোবার ঘরে যেতে হয়। একলা থাকি বলে এই ব্যবস্থায় কোনো অসুবিধে হয় না। আজ নবেন্দুবাবু আসায় একটু মুশকিলই হল।

আমি বললাম, আমার অ্যাপার্টমেন্ট নেহাতই ছোট। চটপট কিছু করা মুশকিল। তাই এবার উঠুন।

নবেন্দুবাবু বললেন, অ্যাপার্টমেন্ট ছোট হলেও সবকিছুই তো আছে।

এবার আমি হাসতে হাসতে বললাম, আছে সবকিছুই ; তবে আমি বাথরুম গেলে আপনাকে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

উনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তার মানে?

বাথরুম খুবই ছোট। তাই এই ঘর হয়ে শোবার ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পরতে হয়।

সর্বাঙ্গ আবরণকারী কিছু ব্যবহার কর না?

অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে ওই তো একমাত্র পোশাক।

তাহলে আর চিন্তার কি?

না না, চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু চটপট কাজ করতে আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে।

তোমার অসুবিধে না হলে আমারও হবে না।

আমি আগের দিন রাত্রেই সবকিছু রান্না করে রেখেছিলাম। তাই নবেন্দুবাবু বাথরুমে যেতেই আমি ভাত বসিয়ে দিলাম। অন্যান্য খাবার-দাবার গরম করতে না করতেই উনিও তৈরি হয়ে গেলেন।

খেতে বসে নবেন্দুবাবু বললেন, এত রান্না করেছ কেন?

রান্না করতে আমার ভালো লাগে। তাছাড়া শনি-রবিবারেই শুধু একটু বেশি রান্না করি। অন্যদিন তো যাহোক কিছু খেয়ে নিই।

উনি হেসে বলেন, তুমি রান্না করতে ভালোবাস আর আমি খেতে ভালোবাসি।

আমি জানি।

স্যার সে কথাও তোমাকে জানিয়েছেন?

আমরা দুজনেই হাসি।

খেয়ে নবেন্দুবাবু সত্যি তৃপ্তিলাভ করলেন। আমার রান্না খেয়ে তন্ময়ও এমনি তৃপ্তিলাভ করত। খাওয়া-দাওয়া শেষে উনি বললেন, ওবেলায় রান্না করো না।...

কেন?

প্যারিসে এসেও শনিবার সন্ধ্যা বাড়ির মধ্যে কাটাব?

না, সেদিন সন্ধ্যায় নবেন্দুবাবু আমার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে বন্দী রইলেন না। বেরিয়ে পড়লেন। একলা নয়, আমাকে সঙ্গে নিয়েই বেরুলেন।

যেসব ভারতীয়রা নিজের স্ত্রীর হাত ধরে রাস্তায় চলাফেরা করতেও অভ্যস্ত নয়, যারা বেশি চা খাওয়া পর্যন্ত পছন্দ করেন না, তারাই প্যারিসে এসে বোতল বোতল শেরি-স্যাম্পেন বা ওয়াইন খান আর বিবস্ত্রা সুন্দরী যুবতীর নাচ দেখেন।

কলকাতার বিখ্যাত অধ্যাপক নবেন্দুবাবুও ব্যতিক্রম হলেন না। নাচ দেখতে দেখতে উনি আমাকে বললেন, যাই বল কবিতা, এরা প্রাণ খুলে আনন্দ করতে জানে। আর এরা প্রাণভরে আনন্দ করে বলেই প্রাণভরে কাজও করে।

আমি বললাম, বোধহয় প্রাণভরে কাজ করে বলেই এমন আনন্দ করতে পারে।

আরো এক বোতল ওয়াইন পেটে যাবার পর নবেন্দুবাবু হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কবিতা, আমরা খুব কাজও করব, খুব আনন্দও করব।

আমি বুঝলাম, উনি স্বাভাবিক নেই। তাই হেসে বললাম, নিশ্চয়ই আপনি কাজও করবেন, আনন্দও করবেন।

প্যারিসে এসে প্রথম সন্ধ্যা ওর ভালোই কাটল। নাচ-গান খানা-পিনা সেরে আমরা যখন অ্যাপার্টমেন্টে ফিরলাম, তখন রাত প্রায় দুটো।

অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে ঢুকতেই উনি আমার কোমর জড়িয়ে কাছে টান দিয়ে বললেন, কবিতা, তুমি বড় ভালো মেয়ে।

আমি হেসে বললাম, ধন্যবাদ। ওর হাতে টান দিয়ে বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি শোবার ব্যবস্থা করি।

এই সন্ধেবেলায় শোবে?

এখন অনেক রাত হয়েছে।

সো হোয়াট? হ্যাভ ইউ গট এনি ড্রিঙ্ক?

নো।

প্যারিসে থাকো আর বাড়িতে একটা বোতল রাখ না?

না। এবার আমি একটু জোর করেই ওর হাতটা সরিয়ে দিলাম। বললাম, আপনি অনেক ড্রিঙ্ক করেছেন। এবার আপনি জামাকাপড় পাল্টে শুয়ে পড়বেন।

নো ডার্লিং! আই মাস্ট নট স্লিপ টু নাইট।

তাহলে আপনি এ ঘরে বসে থাকুন ; আমি ঘরে শুতে যাচ্ছি।

ঠিক আছে, চল, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

আমার এমনিই ঘুম আসবে। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

তোমার মতো সুন্দরীকে ঘুম পাড়াতে আবার কষ্ট হয় নাকি? বরং...

আঃ! কী যা তা বলছেন?

আই অ্যাম সরি কবিতা।

যাই হোক প্রায় জোর করেই ওকে শুইয়ে দিলাম। মাঝখানের দরজা লক করে আমিও শুয়ে পড়লাম। তখন প্রায় তিনটে বাজে।

পরের দিন ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। ও ঘরে নবেন্দুবাবু তখনো ঘুমোচ্ছেন। আমি বাথরুম থেকে ঘুরে এসে চা খেলাম। কাপড়-চোপড় বদলেই কিছু কেনাকাটার জন্য দরজা লক করে বেরিয়ে পড়লাম। কিছু সব্জি আর চিকেন কিনে ফিরে এসে দেখি, নবেন্দুবাবু ড্রইংরুমে বসে আছেন।

আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সংসারের কাজকর্ম আরম্ভ করে দিয়েছ?

একটু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলাম।

চা খাওয়াবে?

নিশ্চয়ই।

চা খেতে খেতেই নবেন্দুবাবু বললেন, কবিতা তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, কী অপরাধ করেছেন যে ক্ষমা চাইছেন?

কাল রাত্রে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করিনি।

আমি হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কী করে জানলেন আপনি খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করেননি?

আমার লেখাপড়া-বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় বাইরের লোকজন জানতে পারে কিন্তু আমার আসল স্বভাব চরিত্রের খবর শুধু আমিই জানি।

এ কথা তো সবার বেলায় প্রযোজ্য।

তা ঠিক কিন্তু সবার স্বভাব-চরিত্রের তো তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য খবর থাকে না—আমার আছে।

আমি আর প্রশ্ন করি না। চুপ করে থাকি। চা খাই। নবেন্দুবাবু বলেন, আমি বিশেষ ড্রিঙ্ক করি না। কাল ড্রিঙ্ক করলাম প্রায় বছর খানেক বাদে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। এবার একটু হেসে বললেন, গত বছর সিমলা ইনস্টিটিউট অব হায়ার স্ট্যাডিজে গিয়েছিলাম দেড় মাসের জন্য। অস্ট্রেলিয়ার এক অল্পবয়স্কা অধ্যাপিকাও তখন ওখানে এসেছিলেন। ক'দিনের ছুটিতে চাইল বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ আমার হোটেলেই ওর সঙ্গে দেখা।...

আমি বললাম, ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে তখন ড্রিঙ্ক করেছিলেন বুঝি?

নবেন্দুবাবু বললেন, শুধু ড্রিঙ্ক করিনি, তিনটে রাতও ওরই সঙ্গে কাটাই।

আমি পট থেকে ওর কাপে চা ঢেলে দিই। উনি চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, আমাদের দেশে বদমাইসি করার চাইতে বদমাইসি করার খবর ছড়িয়ে পড়াকে সবাই ভয় করে। আমিও করি। তাই আমিও এসব কথা কখনও কাউকে বলি না।

তাহলে আমাকে বলছেন কেন?

ঠিক কী কারণে বলছি, তা বলতে পারব না ; তবে তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে।

কেন?

উনি একটু হেসে বললেন, ডক্টর সরকার আর অমিয়র কাছে তোমার এত প্রশংসা শুনেছি যে মনে মনে তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু ভেবেছিলাম।

কী ভেবেছিলেন?

সে আর শুনতে চেয়ো না। তোমাকে এয়ারপোর্টে দেখেই আমার রক্ত টগবগ করতে শুরু করে। তারপর সারাটা দিন অনেক কিছু ভেবেছি।

আমি হাসি। জিজ্ঞাসা করি, তারপর?

বদ মতলব মাথায় নিয়েই কাল সন্ধেবেলায় তোমাকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার সংযম দেখে বুঝলাম, তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার হবে না।

ওর কথা শুনে আমি একটু জোরেই হাসি।

না, না, কবিতা, হাসির কথা নয়। যে মেয়ে ওয়াইন খেয়ে ওই রকম অশ্লীল ও উত্তেজনা পূর্ণ নাচ দেখতে দেখতেও নিজেকে সংযত রাখতে পারে, তাকে শ্রদ্ধা করা যায়, ভালোবাসা যায় কিন্তু তাকে নিয়ে বদমাইসি করা যায় না।

বললাম, আমাকে শ্রদ্ধা করারও দরকার নেই, ভালোবাসাও দরকার নেই।

এবার নবেন্দুবাবু একটু হেসে বললেন, ওটা আমার মনের ব্যাপার। তারপর উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যাই হোক, তোমাকে অনেক কিছু বলব।...

কী দরকার?

হাজার হোক তুমি একলা থাকো। তোমার জানা দরকার, তোমার আশেপাশে আমার মতো হিংস্র নেকড়েও ঘোরাঘুরি করছে।

সত্যি রিপোর্টার, নবেন্দুবাবু আমার এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। যে কালো মেয়েটির দুটি বড় বড় ঘন কালো চোখের আলোয় তুমি অন্ধকার পথ দেখতে পেয়েছ, সে আর তুমি আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

কুড়ি

নবেন্দুবাবু প্যারিস থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে থাকলেও প্রায় প্রত্যেক শুক্রবার বিকেলে এসে হাজির হতেন ; তবে হ্যাঁ, আমার ওখানে উঠতেন না। আমার অ্যাপার্টমেন্টের কাছেই একটা ছোট হোটেলে উঠতেন। আমরা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, গল্পগুজব, ঘোরাঘুরি করতাম। বেশ কেটে যেত সপ্তাহের শেষ দুটো দিন।

মাস দুই এইভাবে চলার পর সত্যি আমরা দুজনে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম। প্রথম প্রথম বিদেশে আসার পর পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ভয় করত, দ্বিধা হতো। আস্তে আস্তে এই ভয় বা দ্বিধা সংকোচ কেটে গেল। তাই তো নবেন্দুবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে খুব

বেশি সময় লাগল না।

কফি খেতে খেতে আমি বললাম, সারাদিনই তো আমার এখানে কাটান। রাত্তিরের ক'টা ঘণ্টা কাটাবার জন্য এতগুলো ফ্লাঙ্ক নষ্ট করে হোটেলে থাকার কী দরকার?

নবেন্দুবাবু হেসে বললেন, শুধু তোমার জন্যই তো হোটেলে থাকি।

আমার জন্য আপনি হোটেলে থাকেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার জন্য।

আমার জন্য আপনি কেন হোটেলে থাকবেন?

সত্যি বলছি কবিতা, তোমার জন্যই হোটেলে থাকি। দিনেরবেলা তবু কোনোমতে নিজেকে সংযত রাখতে পারি। সন্ধের পর কয়েক পেগ হুইস্কি বা দু-এক বোতল ওয়াইন পেটে পড়ার পর তোমাকে দেখে যে আমার কি মনে হয়...

অত ভূমিকা না করে আসল কথা বলুন।

এবার উনি হেসে বললেন, আমার মতো দস্যু রাত্তিরে তোমার এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকলে কত কী সম্পদ যে লুঠ করবে, তার কী ঠিকঠিকানা আছে?

আমিও হেসে বলি, কোনো দস্যুই এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কিছু ক্ষতি করতে পারে না।

কথাটা সত্যি হলেই ভালো।

আরো কিছুদিন এইভাবে মেলামেশা করার পর মনে হল নবেন্দুবাবু চরিত্রহীন হলেও মানুষ হিসেবে ভালোই। তাছাড়া মনে হল, এত বিদ্যা-বুদ্ধি সাফল্যের মধ্যেও ওর মনে অনেক ব্যথা-বেদনা লুকিয়ে আছে।

ভাই রিপোর্টার, দুনিয়ার সবাই জানে মদ্যপানের অনেক দোষ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে মদ্যপান মানুষকে সত্যবাদী করে। মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় যে কথা কোনোদিন কাউকে বলতে পারবে না, মদ্যপানের পর সেই মানুষই তার সব গোপন কথা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারে। একদিন মদ্যপানের পর নবেন্দুবাবুও আমাকে অনেক দুঃখের কথা বললেন।

একে গরিব স্কুল মাস্টারের ছেলে, তার ওপর ন'টি ভাইবোন। এ ছাড়াও এক বিধবা পিসিমা ও তার কন্যা। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যেই নবেন্দু স্কুল শেষ করে কলেজে ভর্তি হলেন। প্রথম বার্ষিকী পরীক্ষার খাতা দেখেই অধ্যক্ষ উষানাথ বসু চমকে উঠলেন। কয়েকদিন পরে ক্লাসে এসে নবেন্দুর খোঁজ করতেই টের পেলেন, দীর্ঘদিন মাইনে না দেবার জন্য ওর নাম রেজিস্টারে নেই।

অন্ধকার রাত্রির পরই সূর্যোদয়। অধ্যক্ষ উষানাথ বসুর কৃপায় নবেন্দু সসম্মানে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করে এম. এ পড়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন।

নবেন্দুবাবু হেসে বললেন, এম. এ পড়ার সময় পেয়ে গেলাম ডক্টর সরকারকে। উনি না থাকলে আমার এম. এ. পাশ করা হতো না। বাড়িতে থাকলে লেখাপড়া করতে অসুবিধে হবে বলে পরীক্ষার আগের তিন মাস উনি আমাকে ওঁর বাড়িতেই রেখে দিলেন।

সত্যি, ডক্টর সরকারের মতো মানুষ হয় না।

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওঁর সংগ্রহ করা মেটিরিয়ালস আর নোট্স নিয়েই আমি আমার প্রথম বই লিখি। নবেন্দুবাবু একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, আমি জীবনে আর কোনো অধ্যাপক দেখিনি যিনি ছাত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য এমন ভাবে স্বার্থত্যাগ করবেন।

তারপর?

পরীক্ষার ফল ভালোই হয়েছিল বলে অধ্যক্ষ ঊষানাথ বসু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একশো পঁচিশ টাকার লেকচারার করে দিলেন গিরিডির এক কলেজে।

নবেন্দুবাবু গেলাসে শেষ চুমুক দিতেই আমি আবার গেলাস ভরে দিলাম।

এ কী? আবার দিলে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। তারপর কী হল বলুন।

নবেন্দুবাবু হেসে বললেন, অধ্যক্ষ মহাশয় লুকিয়ে আমার গরিব বাবাকে কিছু অর্থ দিয়ে আমাকে কিনে নিলেন।...

আমি একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করি, কিনে নিলেন মানে?

নবেন্দুবাবু গেলাসে চুমুক দিয়ে আবার একটু হাসেন। বলেন, অধ্যক্ষ কন্যা শ্রীমতী শিখারাণীর সঙ্গে আমার বিবাহ হল এবং মাত্র ছ' মাস পরই তিনি একটি পুত্ররত্ন প্রসব করলেন।

ছ' মাসে?

হ্যাঁ কবিতা, ছ' মাসে। গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য আমি না জেনে গর্ভবতী শিখারাণীকেই বিয়ে করেছিলাম।

কী আশ্চর্য! কিছু আশ্চর্যের না। এই পৃথিবীতে যে যত বেশি ঠকাতে পারে সে তত বেশি বুদ্ধিমান।

তারপর কী করলেন?

শিখারাণী হাসপাতাল থেকে ফেরার আগেই আমি গিরিডি ছেড়ে পালালাম।

কোথায় গেলেন? বাড়িতে?

না, না। বাবা আর শ্বশুরমশায়ের ওপর এত ঘেন্না হল যে...

বাবা কি অন্যায় করলেন?

একে অধ্যক্ষ মশায়ের মেয়ে, তার ওপর নগদ কয়েক হাজার টাকায় বাবা এমনই বশীভূত হয়ে গেলেন যে বিয়ের আগে তিনি মেয়েও দেখতে গেলেন না।

হা ভগবান!

আরো শুনতে চাও কবিতা?

আপত্তি না থাকলে বলুন।

ছাত্র জীবনে নবেন্দুবাবু লেখাপড়ার নেশায় এমনই মত্ত ছিলেন যে অধ্যক্ষ মশায়ের বাড়িতে নিত্য যাতায়াত করলেও শিখারাণীর দিকে নজর দেবার তাগিদ বোধ করেননি। নবেন্দুবাবুর মতো আরো অনেক ছাত্রই ও বাড়িতে যাতায়াত করত কিন্তু দু-একটা মৌমাছি যে শিখারাণীর জন্যই অধ্যক্ষ মশায়ের অনুগত ছিলেন, তা উনি জানতেনও না।

যাই হোক, সংসার জীবনের শুরুতেই এমন বিশ্বাসঘাতকতার বলি হয়ে নবেন্দুবাবু হঠাৎ একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে গিরিডি থেকে উধাও হয়ে গেলেন। প্রথমে কিছু দিন পাগলের মতো ঘুরে বেড়ালেন যত্র-তত্র। তারপর আবার অধ্যাপনা শুরু করলেন। প্রথমে আগ্রা, তারপর লুধিয়ানা। কয়েক মাস লুধিয়ানায় থাকার পর ফিরোজপুর। না, ওখানেও বেশি দিন থাকতে পারলেন না। চলে গেলেন লক্ষ্মৌ ; লক্ষ্মৌ থেকে কাশী।

বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুপুরুষ নবেন্দুবাবুর ওপর নজর পড়ল প্রবীণ অধ্যাপক প্রমোদ মিত্তিরের। এক রবিবার সকালে উনি হঠাৎ নবেন্দুবাবুর কাছে হাজির।

নবেন্দুবাবু চমকে উঠলেন, আপনি!

হ্যাঁ আমি। তুমি একলা থাক বলে মাঝে মাঝেই সন্ধের পর আসি, কিন্তু কোনো দিনই

দেখা পাইনি।

আপনি আমার এখানে এসেছিলেন?

প্রমোদবাবু একটু হেসে হাতের ছড়িটাকে পাশে রেখে বললেন, এসেছিলেন মানে? বেশ কয়েকদিন এসেছি।

নবেন্দুবাবু অত্যন্ত লজ্জিতবোধ করেন। বলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু আমি তো জানতাম না, তাই...

প্রমোদবাবু আবার হাসেন। বলেন, তোমার মতো ব্যাচেলার হলে আমিও থাকতাম না। যাকগে, ওসব কথা বাদ দাও। আজ দুপুরে আমার ওখানে চলে এসো। আড্ডাও হবে, খাওয়া-দাওয়াও হবে।

কিন্তু...

ওসব কিন্তু-টিন্তু বললে চলবে না। তোমাকে আসতেই হবে।

নবেন্দুবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, প্রমোদবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি, আমার শ্বশুর, শাশুড়ি ও শিখারাণী তার জারজ সন্তান নিয়ে হাজির।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। আমি জানতাম না প্রমোদবাবু ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

আমি অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করি, তারপর কি হল?

স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীর মুখে যে দুঃখ বেদনা থাকে, তার চিহ্নমাত্রও শিখারাণীর মুখে দেখলাম না!

বলেন কি?

হ্যাঁ কবিতা ঠিকই বলছি। রাগে, দুঃখে ঘৃণায় আমি সঙ্গে সঙ্গেই প্রমোদবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং সেই রাত্রেই কাশী ছেড়ে সোজা হরিদ্বার চলে গেলাম।

প্রশ্ন করলাম, আপনার বাবা-মার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতেন না?

চিঠিপত্র লিখতাম না, কিন্তু প্রত্যেক মাসে মাকে টাকা পাঠাতাম।

আচ্ছা, তারপর বলুন।

নবেন্দুবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বললেন, হরিদ্বারে গিয়ে অঘটন ঘটে গেল।

ওর হাসি দেখে আমারও হাসি পায়। বলি, কী আবার অঘটন ঘটল?

আবার কোনো প্রমোদবাবুর সঙ্গে যাতে দেখা না হয়, এই ভেবে আমি গুজরাতিদের একটা ধর্মশালায় উঠেছিলাম। আসার সময় ট্রেনে ঘুম হয়নি বলে প্রথম দিন ঘুমিয়েই কাটালাম। তারপর থেকে দু-এক ঘণ্টা ব্রহ্মকুণ্ডে ঘোরাঘুরি ছাড়া বাকি সব সময় ধর্মশালায় নিজের ঘরেই থাকতাম।

সারাদিন ঘরে বসে কী করতেন?

আমার ঝোলার মধ্যে সঞ্চয়িতা ছিল। সারাদিন আপন মনে কবিতা পড়তাম। কখনও জোরে জোরে, কখনও মনে মনে।

তারপর?

দু-একদিন পরে দুপুরের পর হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা পাঁচ-ছ' বছরের একটি ছেলের হাত ধরে নবেন্দুবাবুর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবেন?

ভদ্রমহিলা পরিষ্কার বাংলায় বললেন, না এমনিই এলাম।

নবেন্দুবাবু ওর হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর না দেখে ভেবেছিলেন উনি গুজরাতি। তাছাড়া পরনে সাদা শাড়ি। তাই একটু অবাক হয়েই বললেন, আপনি বাঙালি?

হ্যাঁ।

নবেন্দুবাবু বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন, আসুন। তারপর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার ছেলেটি তো ভারি সুন্দর।

ও আমার ভাইপো।

ও! এবার নবেন্দুবাবু শতরঞ্চিটা বিছিয়ে দিয়ে বললেন, বসুন।

ওরা শতরঞ্চিতে বসতেই নবেন্দুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা বুঝি দল বেঁধে বেরিয়েছেন?

না, দাদা-বৌদির সঙ্গে এসেছি।

দাদা বৌদিকেও ডাক দিন।

ওরা আজ হৃষিকেশ গেলেন। কাল ওখান থেকে কেদার বদ্রী রওনা হবেন।

আপনি গেলেন না?

ভদ্রমহিলা একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, বিধবা বোনকে হরিদ্বার পর্যন্ত এনেছে, আর কত ঘোরাবে?

নবেন্দুবাবু চমকে উঠলেন। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ভাইপোকে আপনি কাছেই রেখে দিলেন?

হ্যাঁ, ও আমার কাছেই সব সময় থাকে।

সব সময় মানে?

ভদ্রমহিলা আবার একটু হাসেন। বলেন, আমার বৌদিও চাকরি করেন ; তাছাড়া একটু বেশি ঘোরাঘুরি পছন্দ করেন।

এবার নবেন্দুবাবুও একটু হেসে বলেন, বুঝেছি।

ভদ্রমহিলাও হাসেন। বলেন, শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের চেহারাটা বদলালেও চরিত্রটা বদলায়নি। যাক, আমার কথা বাদ দিন। আপনার কথা বলুন।

কী জানতে চান বলুন।

হরিদ্বারে কেন এলেন?

তীর্থস্থানে কেন এসেছি ; তাও বলতে হবে?

আপনি তো তীর্থ করতে আসেননি। সারাদিন তো ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে আবৃত্তি করেই কাটিয়ে দিচ্ছেন।

কোনোমতে কিছু সময় কাটাবার জন্যই এখানে এসেছি। তা আপনি কি করে দিন কাটাচ্ছেন।

গঙ্গস্নান, রান্নাবান্না, দিবানিদ্রা, গঙ্গারতি...

আপনি রোজ গঙ্গায় স্নান করেন?

হ্যাঁ। আপনি গঙ্গায় স্নান করেননি?

না। কেন, হরিদ্বারে এলেই বুঝি গঙ্গাস্নান করতে হয়?

তা নয়, তবে এখানকার গঙ্গায় স্নান করার একটা আলাদা আনন্দ আছে।

তাই নাকি?

নিশ্চয়ই। এবার ভদ্রমহিলা একটু হেসে বললেন, কাল সকালে আপনাকে গঙ্গায় নিয়ে যাব। দেখবেন, স্নান করে কি আরাম।

নবেন্দুবাবু হাসেন। কিছু বলেন না।

ভদ্রমহিলা এবার বললেন, আমাদের এই ধর্মশালা থেকে গঙ্গা এত কাছে যে আমার তো মনে হয়, সময় পেলেই গঙ্গায় স্নান করে আসি।

গঙ্গাস্নান করতে আপনার এত ভালো লাগে?

গঙ্গাস্নান করতে ভালো লাগে না ; তবে এখনাকার গঙ্গায় স্নান করতে সত্যি ভালো লাগে।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, পরদিন গঙ্গায় স্নান করেছিলেন?

নবেন্দুবাবু হেসে বললেন, পরদিন ভোরবেলায় উমা যখন ডাকল, তখন আর না করতে পারলাম না।

গঙ্গাস্নান করে কেমন লাগল?

নবেন্দুবাবু আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, গঙ্গাস্নান করে সারা শরীরটা জুড়িয়ে গেল ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উমাকে দেখে আমার সারা শরীরে আবার আগুন জ্বলে উঠল।

কেন?

ওখানে মেয়ে পুরুষের স্নান করার কোনো আলাদা ঘাট নেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, নবেন্দুবাবু একটু থামলেন ; যেন হরিদ্বারের গঙ্গাস্নানের দৃশ্যটা একবার ভালো করে মনে করে নিলেন। তারপর বললেন, উমা ভাইপোকে স্নান করিয়ে আমার পাশেই স্নান করতে নামল। তারপর স্নান করে দুজনেই একসঙ্গে উঠলাম।

প্রশ্ন করলাম, তারপর?

ভেজা কাপড়ে ওকে দেখেই আমি চমকে উঠলাম। তারপর ওই অবস্থায় ওর পাশাপাশি ধর্মশালা পর্যন্ত আসতে আসতে...

উনি কাপড় বদলে নিলেন না কেন?

ঘাটের ওপর অত লোকের সামনে ও কাপড় বদলাতো না। গায়ে একটা গামছা জড়িয়ে ধর্মশালায় এসেই...

তারপর বুঝি গঙ্গাস্নানের ব্যাপারে আপনিও খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন?

শুধু গঙ্গাস্নানের ব্যাপারে নয়, সব ব্যাপারেই অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠলাম।

নবেন্দুবাবুর কথায় কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেও প্রশ্ন করলাম, সব কিছু ব্যাপারে মানে?

উনি একটু হেসে বললেন, উমার দাদা-বৌদি কেদার-বদ্রী ঘুরে আসার আগেই আমাদের নাটক জমে উঠল।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই উনি বললেন অবাক হচ্ছ কেন? যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে কী এমন শিকার ছেড়ে দিতে পারে?

কিন্তু বাঘিনী?

তার অবস্থাও তো আমারই মতো।...

কিন্তু...

উনি একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, জোয়ারের জলে ওসব কিন্তু কোথায় যে চলে গেল, তা কেউই টের পেলাম না।

নবেন্দুবাবু এবার চুপ করে যান। কিছু বলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করলাম, কী হল? চুপ করে গেলেন কেন? তারপর কী হল?

উনি খুব জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। শুধু জেনে রাখ, সত্যি আমি উমাকে ভালোবেসেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, ও নতুন করে বেঁচে উঠুক, কিন্তু

ও কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হল না।

কেন?

বিধবা হবার পর বিয়ে করার জন্য মনের যে জোর চাই, তা ওর ছিল না।

আমি আর কোনো প্রশ্ন করি না। চুপ করে থাকি।

নবেন্দুবাবু বললেন, উমা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মনে হল, এ তো আরেক শিখারাণী। পর পর দু'বার আঘাত পেয়ে আমিও ওদের মতো ব্যাভিচারী হয়ে উঠলাম।

এবারও আমি কোনো প্রশ্ন করি না।

উনি বললেন, তুমি বিশ্বাস কর কবিতা, ওদের দুজনের নোংরামির জন্যই আমিও নোংরা হয়ে গেলাম। এখন এতই খারাপ হয়ে গেছি যে আর ভালো হতে ইচ্ছাও করে না। বোধহয় সম্ভব নয়।

জানো রিপোর্টার, নবেন্দুবাবু দেশে ফিরে যাবার দিন ওরলি এয়ারপোর্টে আমাকে বলেছিলেন, কবিতা, তোমার কাছেই প্রথম হেরে গেলাম, কিন্তু তবু মনে কোনো অতৃপ্তি নিয়ে দেশে ফিরছি না। জীবনে যে কোনো প্রয়োজনের দিনে আমাকে মনে করলে আমি সত্যি খুশি হব।

একুশ

সত্যি বলছি, আমি কোনো পুরুষের সঙ্গেই বিশেষ ঘনিষ্ট হতে চাই না কিন্তু এমনই অদৃষ্ট যে বার বার বহু পুরুষেরই সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হতে হয়েছে আমাকে। তোমার মতো দু' চারজনের কথা আলাদা। তোমার মতো একজনকে কাছে পেলে তো আমি ধন্য হয়ে যেতাম কিন্তু তা কী আমার কপালে সম্ভব?

যাই হোক নবেন্দুবাবু চলে যাবার পর সত্যি মন খারাপ হয়ে গেল। এই সংসারে শুধু পুরুষরাই মেয়েদের ক্ষতি করে না ; মেয়েরাও বহু পুরুষের সর্বনাশ করে। নবেন্দুবাবুর প্রতি সমবেদনা অনুভব করলাম মনে মনে। শুক্রবার বিকেলবেলায় মনে হতো, আরো ক'টা দিন ওকে আটকে রাখলে বেশ ভালো হতো।

নবেন্দুবাবুর চিঠি এলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম। আবার ওর চিঠি এলো, আবার আমি জবাব দিলাম। প্রতি সপ্তাহে আমি ওর চিঠি পাই, আমি ওকে চিঠি দিই! এইভাবেই বেশ ক'টা মাস কেটে গেল।

সেদিন শনিবার। ঘুম ভেঙে গেলেও বিছানায় শুয়ে আছি। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

হ্যালো!

নমস্কার!

এক ভদ্রলোকের গলায় বাংলা শুনেই আমি চমকে উঠে বসলাম।

আমি প্রতি নমস্কার জানাবার আগেই উনি বললেন, আমি মিঃ ব্যানার্জি। একদিনের জন্য প্যারিস এসেছি ; কালই নিউইয়র্ক চলে যাব...

আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।

না, আপনি আমাকে চিনবেন না। নবেন্দুবাবু আমার দাদার বন্ধু। উনি আপনার জন্য একটা প্যাকেট পাঠিয়েছেন।...

কিন্তু উনি তো আমাকে কিছু জানাননি।

মনে হয় আমি হঠাৎ চলে এলাম বলে কিছু জানাবার সময় পাননি।

সেদিন আমার কোনো এনগেজমেন্ট ছিল না। তাই একটু গল্প গুজব করার লোভে আমি নিজেই ওকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি একা একা আসতে পারবেন তো? আপত্তি না থাকলে আমি আপনাকে নিয়ে আসতে পারি।

না, না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমিই পৌঁছে যাব।

ঠিক সময়েই মিঃ ব্যানার্জি এলেন। সুদর্শন ও সুপুরুষ। বয়স আমারই মতো হবে। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স থেকে বি. এ. পাশ করার পর কলকাতা থেকে কনটেমপোরারি হিস্ট্রির এম. এ.। তারপর পরীক্ষা দিয়ে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে প্রবেশ করেছেন। সিঙ্গাপুর থেকে বদলি হয়ে নিউইয়র্কে আমাদের ইউ. এন. মিশনে যাচ্ছেন।

মিঃ ব্যানার্জি নবেন্দুবাবুর প্যাকেট দেবার পর কোটের পকেট থেকে একটা ক্যাসেট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমার প্রিয় শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের গান আছে ; শুনবেন।

নিশ্চয়ই শুনব। উনি আমারও প্রিয় শিল্পী।

উনি হেসে বললেন, আমি পঙ্কজ মল্লিক আর দেবব্রত বিশ্বাসের গানের ক্যাসেট ছাড়া আর কিছু কাউকে প্রেজেন্ট করি না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

খুব ভালো।

লাঞ্চের আগে মিঃ ব্যানার্জিকে জিজ্ঞাসা করলাম, মে আই অফার ইউ এ ড্রিঙ্ক?

ধন্যবাদ! ড্রিঙ্কের কোনো প্রয়োজন নেই।

আপনি ড্রিঙ্ক করেন তো?

ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে এক-আধ পেগ খেতেই হয় ; তাছাড়া খাই না।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কেন?

আমার স্ত্রী ঋতু পছন্দ করে না। মিঃ ব্যানার্জি হেসে বললেন, ওর অমতে একদিন ড্রিঙ্ক করলে ও এক মাস আমাকে পাশে শুতে দেবে না।

ওর কথায় আমি হেসে উঠি।

আমার হাসি থামলে উনি বলেন, বিয়ের পর মেয়েদের জীবনে স্বামী ছাড়া আর কী আছে বলুন? আর সেই স্বামীই যদি তাকে দুঃখ দেয়, তাহলে সে বাঁচবে কেমন করে?

ওর কথায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রথমে মনে মনে ; তারপর বলেই ফেললাম, আপনার মতো পুরুষের সংখ্যা আরো কিছু বেশি হতো তাহলে এই পৃথিবীটা সত্যি অনেক সুন্দর, শান্তির হতো।

কথাবার্তা খাওয়া-দাওয়া করতে করতেই আবিষ্কার করলাম, আমরা দুজনে দুজনের বন্ধু হয়ে গেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতু কবে তোমার ওখানে যাবে?

মাস খানেকের মধ্যেই আসবে।

ঋতু যদি কদিন আমার এখানে না থেকে সোজা নিউইয়র্ক যায় তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ঋতু নিশ্চয়ই তোমার কাছে কদিন থাকবে কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে।

তুমি কী ব্যবসাদার যে এক হাতে দেবে, আরেক হাতে নেবে?
তা নয় তবে...
আগে কথা দাও ঋতুও আসছে ; তারপর তোমার কথা শুনছি।
নিশ্চয়ই ঋতু আসবে।
এবার বলো, তোমার কী দাবি?
তোমাকেও নিউইয়র্ক আসতে হবে।
সত্যি?
তবে কী তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি?
কথা দিচ্ছি, তোমরা নিউইয়র্ক থাকতে থাকতেই আমি একবার ঘুরে আসব।

ভাই রিপোর্টার, মানুষের জীবন পথ যে কখন কোথায় মোড় ঘুরবে, তা কেউ জানতে পারে না। নবেন্দুবাবুর পাঠানো একটা প্যাকেট দিতে এসে বাদল আমার বন্ধু হলো, ভাই হলো। নিউইয়র্ক যাবার পথে ঋতু এসেছিল। কথা ছিল, তিনদিন থাকবে কিন্তু সাতদিন পরে ওরলি এয়ারপোর্টে বলেছিল, এখন মনে হচ্ছে আরো ক'দিন থাকলেই ভালো হতো।

আমি একটু ম্লান হাসি হেসে বললাম, আমার তো মনে হচ্ছে, তুমি না এলেই ভালো হতো।

ঋতু জোর করেই একটু হাসল। তারপর বিদায় নেবার ঠিক আগে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে বললো, বেশি দেরি করো না ; তাড়াতাড়ি এসো।

সত্যি বলছি ভাই, আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি আমি আমেরিকা যাব। তুমি তো জানো লন্ডন-প্যারিসের রাস্তার মোড়ে মোড়ে সস্তায় আমেরিকা ঘুরে আসার বিজ্ঞাপন। আমি কোনোদিন ভুল করেও ওসব বিজ্ঞাপন দেখতাম না। প্রয়োজন মনে করিনি। মনে হতো আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরের দরকার কী?

বাদল আর ঋতুর সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকে রাস্তাঘাটে পত্রপত্রিকায় শুধু ওই বিজ্ঞাপনগুলোই আমার চোখে পড়তে শুরু করল। তারপর ওদের দুজনের কয়েকটা চিঠি আসার পর আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সত্যি সত্যি ওরলি এয়ারপোর্ট থেকে এয়ার ফ্রান্সের প্লেনে নিউইয়র্ক রওনা হলাম!

বিধাতা পুরুষ সত্যি বিচিত্র। ডক্টর সরকারের চিঠি দিয়ে এলেন নবেন্দু ; নবেন্দুবাবুর পাঠানো কিছু জিনিসপত্র দেবার জন্য এলো বাদল—মিঃ এস কে ব্যানার্জি আই-এফ-এস। রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে স্থায়ী ভারতীয় মিশনের সেকেন্ডে সেক্রেটারি। এলো ঋতু। জন এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টে ওরা যেভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করল, তাতে মনে হলো ওরা যেন কত কালের পরিচিত, কত আপন, কত ঘনিষ্ঠ।

সেই প্রথম দিন রাত্রেই ডিনার খেতে খেতে বাদল বললো, কবিতা, শনিবারই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

কোথায়?
কোথায় আবার? ঘুরতে।
না, না, আমি কোথাও যাচ্ছি না।
কেন?
আমি তো আমেরিকা দেখতে আসিনি ; এসেছি তোমাদের দেখতে। ক'টা দিন তোমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করেই বেশ কেটে যাবে।

বাদল আবার আমাকে প্রশ্ন করল, সত্যি কোথাও যেতে চাও না?

আমি হেসে বললাম, ছেলেবেলায় ভেবেছিলাম, ঢাকার সদর ঘাট আর রমনা দেখেই বেশ জীবনটা কেটে যাবে। যখন কলকাতায় এলাম, তখন মনে হয়েছিল, ওখানেই সারা জীবন থাকব।...

বাদল আমার মুখের কথা কেড়ে বললো, তারপর কলকাতা থেকে এলে লন্ডন, লন্ডন ছেড়ে এলে প্যারিস। তাই আর দেশ দেখার শখ নেই, তাই তো?

বললাম, জানি না, ভগবান আমাকে আরো কত ঘোরাবেন। তাই নিজের উদ্যোগে আর ঘুরতে চাই না। ক'টা দিন তোমাদের দুজনকে বিরক্ত করেই কাটিয়ে দিতে দাও।

ঋতু একটু চাপা হাসি হেসে বাদলকে বললো, ও কদিন আমাদের বিরক্ত করুক। তুমি আর আপত্তি করো না।

বাদল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, তবে তাই হোক।

জানো ভাই রিপোর্টার, বেশ কাটছিল দিনগুলো। গল্পগুজব, হাসি ঠাট্টা, মাঝ রাত্তিরে টাইমস্ স্কোয়ার-ব্রডওয়েতে ঘুরে বেড়িয়ে প্রথম সপ্তাহটা বেশ কাটল। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হলো নেমন্তন্নর পালা।

সেদিন পাকিস্তান মিশনের মিঃ আলমের বাড়িতে আমাদের ডিনারের নেমন্তন্ন। বাদল যখন সিঙ্গাপুরে, মিঃ আলমও তখন ওখানে ছিলেন। বাদলের মতো উনিও বিশুদ্ধ বাঙালি। ওদের বন্ধুত্বের আরো একটি কারণ ছিল। আলম সাহেবের মতো ঋতুদেরও দেশ ছিল বরিশালে। সুতরাং আলম সাহেব আর ওর স্ত্রী পারুল এসে আমাকে নেমন্তন্ন করলে আমি সানন্দে তা গ্রহণ করলাম।

ওই আলম সাহেবের ডিনারেই ইউনাইডেট নেশনস-এ কর্মরত কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে আলাপ হলো। তাদেরই একজন মিঃ মুখোপাধ্যায়। বয়স পঞ্চাশের ঘরে। রঙটা একটু ময়লা হলেও সুপুরুষ। চিরকুমার। উনি বলেন, স্কচ, হুইস্কির প্রেমে পড়ার পর জীবনের সব অভাব মিটে যায়। তাই আবার বিয়ে করে শুধু শুধু ঝামেলা বাড়াই কেন?

ঋতু আমার পাশে এসে হাসতে হাসতে ওকে দেখিয়ে বললো, জানো কবিতা, মুখোদার হাতের চিকেন কারি খেলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে।

আমি বললাম, তাই নাকি?

ঋতু বললো, শনিবার তো মুখোদার ওখানে যাচ্ছি। তখন দেখো।

শনিবার মিঃ মুখোপাধ্যায়ের আস্তানায় ডিনার খেতে গিয়েই কথায় কথায় হঠাৎ বাদল ওকে বলল, আচ্ছা মুখোদা, কবিতা তো ইউনেস্কোতে কাজ করছে ; ওকে ইউ এন হেড কোয়ার্টাসে আনা যায় না?

মিঃ মুখোপাধ্যায় হাসতে হাসতে বললেন, স্কচ খেলে ও খাওয়ালে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়।

ঋতু বললো, ক' বোতল চাই?

মিঃ মুখোপাধ্যায় হেসে বললেন, আগে থেকে কী বলা যায়? আগে আমি খবর করি ; তারপর তুমি আমার সেলার ভরে নিও।

আমি বললাম, না, না, আমার জন্য আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি প্যারিসেই বেশ আছি।

বাদল আর ঋতু প্রায় একসঙ্গে বললো, তুমি চুপ করো।

জীবনে যা কোনোদিন ভাবিনি, আশা করিনি, তা আবার ঘটল। ওই বাদল আর ঋতুর আগ্রহে এবং মিঃ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে ছ'মাস পরে আমি প্যারিস ছেড়ে নিউইয়র্কে চলে এলাম।

তারপর?

ক'টা মাস সত্যি আনন্দে কাটালাম। কর্মক্ষেত্র ইউনাইটেড নেশনস্ হেড কোয়ার্টার্স। সারাটা দিন সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষের মিলন তীর্থে বেশ আনন্দে ও উত্তেজনার মধ্যে কেটে যায়। কখনও কাছ থেকে, কখনও দূর থেকে দেখি বিশ্বের বরেণ্য নেতাদের। চোখের সামনে ঘটতে দেখি এমন অনেক ঘটনা যা পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। এর উপর আছে বাদল আর ঋতু।

সত্যি বলছি ভাই, নিউইয়র্কে আসার পর প্রথম কিছুকাল কি নিদারুণ আনন্দে দিন কাটিয়েছি তা তোমাকে লিখে বোঝাতে পারব না। ইতিমধ্যে স্বাভাবিকভাবেই মিঃ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। বন্ধুত্ব হয়েছে আরো কয়েকজনের সঙ্গে ; আর আলাপ পরিচয় হয়েছে বহুজনের সঙ্গে।

তারপর হঠাৎ একদিন বাদল ফার্স্ট সেক্রেটারি হয়ে চলে গেল রাওয়ালপিণ্ডি। যে জন. এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টে ওরা আমাকে অভ্যর্থনা করেছে, সেই এয়ারপোর্টেই আমি চোখের জলে বিদায় জানিয়ে এলাম।

এয়ারপোর্ট থেকে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছিলাম আর ভাবছিলাম, ভগবান কী আমাকে নিঃসঙ্গ না রাখলে শান্তি পান না। আরো কত কী ভাবছিলাম আর কাঁদছিলাম ; কাঁদছিলাম আর ভাবছিলাম।

হঠাৎ মিঃ মুখোপাধ্যায় এসে হাজির।

অবাক হয়ে আমি বললাম, আপনি? এ সময়?

মিঃ মুখোপাধ্যায় একটু হেসে বললেন, আজ আপনার মনের অবস্থা চিন্তা করেই চলে এলাম।

ভালোই করেছেন।

কেন বলুন তো?

আজ একলা একলা থাকলে আমি পাগল হয়ে যেতাম।

উনি আর কোনো ভূমিকা না করেই বলেন, নাউ গেট আপ। চলুন বেরিয়ে পড়ি।

কোথায়?

আমার ওখানে।

আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে ওর ওখানে চলে গেলাম। তারপর উনি আমাকে হুইস্কি অফার করতেই বললাম, আমি তো বিশেষ খাই না।

উনি বললেন, আজ আর আপত্তি করবেন না। দেখবেন, ভালোই লাগছে।

আমি একটু হাসি।

উনি গেলাস তুলে বললেন, ফর ইওর হ্যাপিনেস।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাস তুলে বললাম, ফর ইওর হ্যাপিনেস অ্যাজ ওয়েল।

সত্যি বলছি ভাই, বেশ কেটে গেল সময়টা। দু'তিন পেগ হুইস্কি খেলাম ; ডিনারও খেলাম। মিঃ মুখোপাধ্যায়ই আমাকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিলেন। উনি নীচে থেকেই বিদায় নিচ্ছিলেন কিন্তু আমিই ওকে যেতে দিলাম না। বললাম, না, না, মিঃ মুখোপাধ্যায়, তা হয় না। ইউ মাস্ট হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক।

ড্রিঙ্ক!

ইয়েস। ওয়ান ফর দ্য রোড।

গাড়ি থেকে নামতে গিয়েই দুটো পা টলমল করে উঠল। মিঃ মুখোপাধ্যায় তাড়াতাড়ি আমার একটা হাত ধরতেই সামলে নিলাম। এলিভেটরে উপরে উঠে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সময়ও উনি আমাকে আলতো করে ধরে নিয়ে গেলেন।

তারপর মিঃ মুখোপাধ্যায়কে ড্রিঙ্ক অফার করতেই উনি বললেন, আপনাকেও সঙ্গ দিতে হবে।

না, না, আমাকে আর অনুরোধ করবেন না। আর এক পেগ খেলেই আমি বেসামাল হয়ে পড়ব।

এখন আর ভয় কী? এখন তো নিজের অ্যাপার্টমেন্টে এসে গেছেন।

তা ঠিক কিন্তু...

কোনো কিন্তু নয়। আমি একা একা ড্রিঙ্ক করব না। জাস্ট এ পেগ ওনলি। আপনি শুয়ে পড়বেন ; আমিও চলে যাব।

কী আর করব? এ পেগ খেতেই হলো। মিঃ মুখোপাধ্যায় কোনো অশালীন ব্যবহার করলেন না। বিদায় নেবার পূর্ব মুহূর্তে শুধু আমার চিবুকে একটা চুমু খেলেন। আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

বাদল-ঋতু না থাকায় উনিই আমার একমাত্র বন্ধু হয়ে উঠলেন। দুজনেই ইউনাইটেড নেশনস'এ কাজ করি। রোজ না হলেও প্রায়ই ক্যাফেটেরিয়ায় দেখা হয়। একসঙ্গে কফি খাই, গল্পগুজব করি। ওর সাহায্যে আমার ছোটখাটো সমস্যার সমাধান হয়। উইক-এন্ডে উনি আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসেন ; খাওয়া-দাওয়া করেন। আমিও ওর ওখানে সারাদিন কাটিয়ে আসি।

বেশ কেটে গেল ছ' সাত মাস। তারপর ওরই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় আমি ইউ. এন. স্পেশ্যাল কমিটিতে আসি। মাইনেও বেড়ে গেল অনেক। সেই সঙ্গে সম্মান ও সুযোগ। বয়সের ব্যবধান ভুলে আমরা সত্যি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম।

তারপরের ইতিহাস শুনতে চাও? হাজার হোক তুমি আমার আদরের ভাই ; আমি তোমার দিদি। সব কথা বলতে পারব না। বোধহয় প্রয়োজনও নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, মিঃ মুখোপাধ্যায় তিলে তিলে আমাকে গ্রাস করলেন। উনি ওর কামনা-বাসনার আগুনে আমাকে জ্বালিয়ে প্রায় সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়ে আমার জীবন থেকে হঠাৎ বিদায় নিলেন। আমি রাগে-দুঃখে প্রায় হতবাক হয়ে গেলাম। আত্মহত্যা করতে গিয়েও পিছিয়ে এলাম। মনে হলো, ওই একটা পশুর উপর অভিমান করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কোনো যুক্তি নেই, কোনো সার্থকতা নেই।

পুরুষদের উপর তীব্র বিদ্বেষ আর ঘৃণা নিয়ে আমি আবার নতুন করে বাঁচতে চাইলাম। কিন্তু ভাই, এই পুরুষ-শাসিত সমাজে তো বেশি দিন পুরুষদের থেকে দূরে থাকা যায় না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, পুরুষদের কাছে মেয়েদের যেতেই হবে। না যেয়ে কোনো উপায় নেই। আমার মতো নিঃসঙ্গ ও চাকুরিজীবি মেয়ের পক্ষে তো পুরুষদের এড়িয়ে চলা নিতান্তই অসম্ভব।

ভাই রিপোর্টার, তোমার কাছে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করব, আমার জীবনে আরো অনেকে এসেছেন। দু, একজন প্রথিতযশা ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ আমার রূপ যৌবনের

কাছে এমন নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন যে ভাবতে গেলেও আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে উঠি। শুধু তোমার কাছেই বলেছি, স্বীকার করছি, কখনও কখনও আমার দেহ ও মন এমন বিদ্রোহ করে উঠেছে যে আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি সদ্য পরিচিত বন্ধুদের কাছে।

একটা পুরনো কথা মনে পড়ছে। অনেকদিন আগে মার এক দূর সম্পর্কের মাসি আমাকে আপাদ-মস্তক দেখার পর বলেছিলেন, হারামজাদী, তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন দিদি, তুমি একথা বলছ?

ওরে হারামজাদী, তোর যা রূপ, তোর যা শরীর, তাতে কী পুরুষরা তোকে শান্তিতে থাকতে দেবে?

বাজে কথা বলো না।

ওরে হতাভাগী, মেয়েদের এমন সর্বনাশা রূপ, এমন ডাগর-ডোগর দেহ থাকা যে কী অভিশাপ, তা পরে বুঝবি।

আমার সেই দিদিমার কথাটা আমি সেদিন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু পরবর্তীকালে আমি মর্মে মর্মে বুঝেছি, মনে মনে স্বীকার করেছি, মেয়েদের রূপ-সৌন্দর্য সত্যি মহা অভিশাপ।

সেই বেশ ক'বছর আগে কাকাবাবু থেকে শুরু করে অনেক পুরুষের সঙ্গেই অনেক খেলাই খেলতে হলো। অনেকে আমাকে শিকার করলেন ; আমিও কাউকে কাউকে শিকার করে মনের জ্বালা, দেহের দাবি মিটিয়েছি। সত্যি বলছি ভাই, আর ভালো লাগছে না। এখন আমার দেহে মনে নতুন জ্বালা, নতুন স্বপ্ন, নতুন দাবি ; এখন আর আমার এই দেহ কোনো কামনা-জর্জরিত হিংস্র পশুর কাছে বিলিয়ে দিতে পারি না, পারব না কিন্তু এই এত বড় পৃথিবীতে এমন একজন পুরুষও কী নেই যে আমাকে আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে নিয়ে আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিতে পারে? আমাকে সমস্ত অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে? রাতের অন্ধকারে আমাকে তাঁর বলিষ্ঠ দুটো হাতের মধ্যে, বুকের কাছে নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিতে পারে?

তুমিই বলো ভাই, এই পৃথিবীতে কী এমন একজনও উদার মহৎ পুরুষ নেই যিনি আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেন? আমাকে অন্তত একটা সন্তানের জননী হবার গৌরব দান করতে পারেন?

মনে হয়, এই মাটির পৃথিবীতে এমন উদার, মহৎ পুরুষ নেই। এই সংসারের চরম ব্যাভিচারি পুরুষও সতী-সাবিত্রীর মতো স্ত্রী আশা করেন। তাই তো আমি জানি, আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেবেন না কেউ ; আমাকে উপভোগ করার মতো পুরুষের অভাব নেই কিন্তু আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, সন্তানের মা হবার গৌরব দান করতে সবারই কুণ্ঠা, সবারই দ্বিধা।

মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো? মনে হয়, চিৎকার করে সবকিছু বলে দিই। যারা আমাকে উপভোগ করার পরও সুখে শান্তিতে সংসার করছেন, তাঁদের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিই। যেসব গুণী, জ্ঞানী, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা আমার কাছে এসে বার বার ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের মুখোশ খুলে দিই। একবার তো একজন শ্রদ্ধেয় ভারতীয় নেতা ভোরবেলায় আমার বেডরুম স্লিপার পরেই এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে চড়ে দেশে রওনা হয়েছিলেন। তোমাকে কী বলেছি, আমার কাছে বহু গুণী-জ্ঞানী ও যশস্বী নেতার অসংখ্য অশ্লীল প্রেম-পত্র আছে?

এসব কথা বাইরে কাউকে বলিনি, বলব না। বলে কী লাভ? আমি সুখী হলাম না বলে পাঁচজন সুখী মেয়ের সংসারে আগুন লাগাব কেন? নিজের বুকের জ্বালা নিজের বুকের মধ্যেই

চেপে রেখে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছি।

ভাই রিপোর্টার, তোমার ওই তন্বী শ্যামা শিখরদশনা'র সন্তান হলে তারা যেন আমার স্তন্যপান করে আমাকে মাতৃত্বের স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ দেয় ; ওরা যেন আমাকে এই গৌরব থেকে বঞ্চিত না করে।

তোমরা দুজনে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

—তোমাদের দিদি